নক্ষত্রের রাত

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. একটি জার্মান ঘড়ি 3
২. হেক্টর এয়ারপোর্ট 13
৩. পাশা লাউঞ্জের এক প্রান্তে 26
৪. রেবেকা বুঝতেই পারল না 32
৫. ফুড টেকনলজির শর্ট কোর্স 44
৬. আবহাওয়াবিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী 51
৭. রেবেকা কাঁপা গলায় বলল 62
৮. প্রফেসর ওয়ারাডিংটন 75
৯. দেশ থেকে আসা কোনো চিঠি 90
১০. রেবেকার অভ্যেস 102
১১. টেলিগ্রাম আসবে 115
১২. বাড়ি বিশাল 120
১৩. চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত 125

১৪.আকাশে নক্ষত্রের মেলা 127

১. একটি জার্মান ঘড়ি

দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির একটি জার্মান ঘড়ি। অন্ধকারে এর ডায়াল থেকে সবুজ আলো বের হয়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেয়ালের দিকে তাকালে মনে হয় ট্রাফিক সিগন্যাল। খাটটাকে মনে হয় একটা গাড়ি। সবুজ আলো পেয়ে চলতে শুরু করবে।

আজও সে রকম হল। পাশার কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল নিজেকে ধাতস্থ করতে। ভূতুড়ে ঘড়িটা সরিয়ে ফেলা দরকার–এই রকম ভাবতে ভাবতে সে দ্বিতীয় বার তাকাল।

দুটো দশ বাজে।

এত রাতে হঠাৎ করে ঘুম ভাঙল কেন? ঘুম ভাঙার কোনোই কারণ নেই। সে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে নি। কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না। রান্নাঘর থেকে গ্যাস লিক করছে না। হিটিং ঠিকমত কাজ করছে। ঘরের ভেতর আরামদায়ক উষ্ণতা। ঘুম ভাঙার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না। নিউটনের ক্ল্যাসিকাল মেকানিক্স তাই বলে। কাজেই কারণ কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। থাকতেই হবে।

পাশাবিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে পানি ছিটাল। ফ্রীজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করল। সে এখন একটি সিগারেট ধবে এবং বরফ-শীতল এক গ্রাস পানি খাবে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে এই তার রুটিন।

পানিতে ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। এরা কি ইদানীং বেশি করে ক্লোরিন দিচ্ছে? নাকি তার স্নায়ু নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে?

যাদের স্নায়ু নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে, তাদের এরকম হয়। সব কিছুতেই অদ্ভুত কোন গন্ধ পায়। শুরুর দিকে ফরিদের এ রকম হত। যা-ই মুখে দিত থু করে ফেলে দিয়ে বলত-লাশের গন্ধ আসছে। সবাই ভাবত, বোধহয় ঠাট্টা করছে। পাশা এক দিন দামী সেন্টের বোতল খুলে বলেছে, দেখ তো এর মধ্যে কোন অদ্ভুত গন্ধ পাস কি? ফরিদ বাধ্য ছেলের মতো গন্ধ শুকে ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, পচা বট পাতার গন্ধ। খুব হালকা–তবে আছে।

পাশা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই যা শুকছিল, তার নাম ইভিনিং ইন প্যারিস। ছাগলের মতো কথা বলছিস কেন? ফরিদ খুবই অবাক-হওয়া চোখে তাকিয়ে রইল।

কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু ফরিদের সমস্ত ইন্দ্রিয় কোনো রকম কার্যকারণ ছাড়াই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স সম্ভবত জড় পদার্থের জন্যে, মানুষের জন্যে নয়। মানুষের চেতনা বলে একটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরের ব্যাপার আছে।

ওষুধের গন্ধভরা পানির গ্লাস শেষ হয়েছে। এখন শুয়ে পড়া যায়। পাশা ইচ্ছা করে একটা হাই তুলল–ঘুমকে আমন্ত্রণ জানাল। ঠিক তখন টেলিফোন বাজতে লাগল।

নিশিরাতে টেলিফোন কি অন্য রকম করে বাজে? ক্লান্ত সুর বের হয়? নাকি মনের ভুল? পাশা টেলিফোন তুলল। ও পাশে একটি আমেরিকান মেয়ে।

হ্যালো, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?

কার সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি?

পাশা।

কথা বলছি।

মেয়েটির গলায় সাউথের আঞ্চলিক টান আছে। এই দুর্বলতা নিয়েও সে ব্রিটিশ একসেন্ট আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আসছে না।

মিঃ পাশা, আপনি কি বাংলাদেশী?

হ্যাঁ।

আপনি একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলুন। মহিলা আপনার দেশীয়। মনে হচ্ছে তিনি বেশ ঝামেলায় পড়েছেন।

তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?

হেক্টর এয়ারপোর্ট। ঐ মহিলা ঘন্টাখানেক আগে এয়ারপোর্টে এসে পৌছেছে। তাকে যাদের রিসিভ করার কথা, তারা কেউ আসে নি। মেয়েটি খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। খুব ছটফট করছে।

একটা ট্যাক্সি করে হোটলে পাঠিয়ে দাও।

আমি বলেছিলাম। মহিলাটি রাজি হচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম কাঁদছে।

মেয়েটিকে দাও। কথা বলছি ওর সঙ্গে।

ও টয়লেটে গেছে। তোমাকে কিছুক্ষণ হোল্ড করতে হবে। পাশা টেলিফোন কানে নিয়েই সিগারেট ধরাল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি আমার টেলিফোন নাম্বার পেলে কোথায়?

আমেরিকান মেয়েটি আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল। যেন এই প্রশ্নটির জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল।

খুব কায়দা করে বের করেছি। টেলিফোন ডাইরেক্টরি বের করে মেয়েটিকে বলেছি-এখানে নিশ্চয়ই তোমাদের দেশের কেউ-না-কেউ বাস করে। তুমি নামগুলি পড় এবং অনুমান করতে চেষ্টা কর কোন কোন নাম তোমাদের দেশের হতে পারে।

সে শুধু আমার নামই বের করল?

সে অনেকগুলিই বের করেছে। তোমারটাই প্রথম ট্রাই করতে বলল। কারণ তোমার লাস্ট নেম নাকি শুধু তোমাদের দেশের ছেলেদের হয়। কাউড্রি। অদ্ভুত লাস্ট নোম।

কাউড্রি নয়। চৌধুরী। তোমার নাম কী?

এ্যান। আমি এখানেই কাজ করি। আমার ডিউটি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। চলে যেতাম। মেয়েটির জন্যে যেতে পারছি না।

তোমাকে ধন্যবাদ। এখন তুমি চলে যেতে পারবে, আমি যা করণীয় করব।

থ্যাংস।

মেয়েটি কাঁদছিল বললে। ওর বয়স কত? খুব কম বয়স কি?

বুঝতে পারছি না। এশিয়ান মেয়েদের বয়স কেউ বুঝতে পারে না। ও এসে গেছে, তুমি কথা বল।

পাশা একটি কিশোরীর গলা শুনল। থেমে-থেমে ভয়ে-ভয়ে বলা–হ্যালো, হ্যালো।

আপনার ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে?

আপনি দয়া করে একটু আসুন।

আসছি। সমস্যাটি কী? কোত্থেকে আসছেন আপনি?

ঢাকা থেকে।

সরাসরি তো ঢাকা থেকে আসেন নি। পোর্ট অব এন্ট্রি কোথায়? নিউ ইয়র্ক না। সিয়াটল?

নিউ ইয়র্ক। কেনেডি এয়ারপোর্ট। আপনি দয়া করে আসুন।

আপনার সঙ্গে কি শীতের কাপড় আছে? প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাইরে।

গরম সোয়েটার আছে। মাফলার আছে। একটা ওভারকোট ছিল।

ছিল মানে? এখন নেই?

স্যুটকেসে ছিল। সেই সুটকেস কোথায় আছে জানি না। খোঁজখবর করতে পারি নি। আমার ইংরেজি ওরা বোঝে না, আমিও ওদের কথা বুঝি না।

ওদের কথা না বুঝতে পারার কারণ আছে, কিন্তু আপনার কথা ওরা বুঝবে না কেন? এখানে কী জন্যে এসেছেন?

ইউ-এস এইড প্রোগ্রামে এসেছি। তিন মাসের শর্ট ট্রেনিং, ফুড টেকনলজিতে। এয়ারপোর্টে ওদের লোক থাকার কথা। কেউ নেই।

আপনার নাম কী?

রেবেকা। আমার নাম রেবেকা ইয়াসমিন।

আমি আসছি। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে। নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করুন। যে-আমেরিকান মেয়েটির সঙ্গে প্রথম কথা বললাম, সে কি আছে না চলে গেছে?

আছে এখনো, কিছু বলবেন?

না।

পাশা টেলিফোন নামিয়ে পারকুলেটর চালু করল। এক কাপ গরম কফি না খেয়ে বের হওয়া যাবে না। ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। চিল ফেক্টর নিয়ে তাপমাত্রা শূন্যের তিন ডিগ্রী নিচে নেমেছে। অথচ নভেম্বর মাস।

গাড়ি চালু হল সহজেই। ইঞ্জিন গরম করতে দিয়ে কফি নিয়ে বসল এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, মাঝরাতের এই ঝামেলাটা তার ভালোই লাগছে।

এর কারণ কি ফ্রয়েডিয়ান? একটি ছেলে বিপদে পড়ে মাঝরাতে টেলিফোন করলে পাশা নিশ্চয় বিরক্ত হত। বিরক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন বিরক্তি লাগছে না। ভালোই লাগছে। পাশা লক্ষ করল, সে মেয়েটি সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল অনুভব করছে। কল্পনায় যে-ছবিটি ভাসছে, তা হচ্ছে আসমানী রঙের একটা শাড়ি গায়ে মেয়েটি শুকনো মুখে লাউঞ্জে বসে আছে। তার গায়ে লাল রঙের একটা সোয়েটার। ধবধবে সাদা রঙের মাফলারে কান-মাথা ঢাকা। এই মাফলারটি বিদেশযাত্রা উপলক্ষে তার মা কিংবা বড় বোন কিছুদিন আগেই বুনে শেষ করেছেন।

মেয়েটির বয়স কত হতে পারে? গলার স্বর মিষ্টি। কিশোরীদের মতো কাঁচা। তাতে কিছু বোঝা যায় না। অনেক বৃদ্ধা মহিলারও কিশোরীদের মতো নিরিনে গলা থাকে। মিসেস থমসনের বয়স প্রায় সত্তর। কিন্তু তিনি কথা বলেন বালিকাদের গলায়।

পাশা কাপড় পরতে শুরু করল। বাইরে যাবার জন্য কাপড় পরা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। থারমাল আণ্ডারওয়ার। গরম পুলওভারের উপর পার্ক। কানঢাকা টুপি। মেয়েটির জন্যেও গরম কাপড় নিয়ে যেতে হবে। শূন্য ডিগ্রীর নিচের তাপমাত্রা সম্পর্কে এদের

কোনো ধারণা নেই। বাইরে বের হলে প্রথম কিছুক্ষণ মনে হবে–এমন কিছু ঠাণ্ডা তো নয়। তার পরই স্নায়ুতে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগবে। বুক ব্যথা করতে শুরু করবে।

পাশা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে মেয়েটি সম্পর্কে একটি ছবি দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। ফরিদের ভাষায় এনালাইটিক্যাল রিজনিং ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে যাওয়া।

রেবেকা নামের মেয়েটির বয়স অল্প হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ইউএস এইড প্রোগ্রাম- কাজেই সে কৃষি বিভাগে কাজটাজ করে। এসব স্কলারশিপ সিনিয়ারিটি দেখে দেওয়া হয়, কাজেই মেয়েটি যথেষ্ট সিনিয়ার।

মেয়েটি বিবাহিত। কারণ একটি অবিবাহিত মেয়েকে বাবা-মাকিছুতেই একাএকা এত দূর পাঠাবেন না।

সে এক জন বিশালদেহী মহিলা। কারণ তার গলার স্বর মিষ্টি। ভারি মানুষদের গলা সাধারণত মিষ্টি হয়। ভোকাল কর্ডের সঙ্গে শরীরের মেদের একটি সম্পর্ক আছে।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কারণ শীতের দেশে আসছে বলেই তারা একটি মাফলার বুনে দিয়েছে। এসব জায়গার শীত সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা নেই। বাইরে যাবার আগে কিছু একটা বুনে দেওয়া বা সেলাই করে দেওয়ার মত সেন্টিমেন্ট নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারই দেখায়। পাশার এক বার মনে হল, তার এনালাইটিক্যাল রিজনিং-এ একটু খুঁত আছে। সে ধরেই নিয়েছে মাফলারটি হাতে বোনা। এটা নাও হতে পারে। হয়তো এটা কেনা জিনিস।

রেবেকা নামটিও পুরন। স্কুল-মিস্ট্রেসদের নামের মতো। এই নামটি পরিষ্কার বলে দেয়– এই মেয়ে একালের মেয়ে নয়। একালের মেয়েদের নাম হয় ত্রপা বা মৌলি।

পাশা ক্যাসেট চালু করল। কোনো শব্দ হল না। ঘাঁসর্ঘাস আওয়াজ। হেড পিস নষ্ট হয়ে গেছে, আর নতুন কেনা হয় নি। বেশ ক দিন ধরেই এটা নষ্ট। তবু কেন মনে পড়ল না! এসব কি বয়সের লক্ষণ? আটত্রিশ বছর কি খুব একটা বেশি বয়স? এ দেশের জন্যে নিশ্চয়ই নয়? মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে। সুষম খাদ্য, চিকিৎসা, উন্নত জীবনযাত্রা। মানুষের আয়ু সভ্য দেশগুলিতে বাড়তেই থাকবে, এবং এক সময় মানুষ হয়তো অমর হয়ে যাবে। বইপত্রের অমরতা নয়। সত্যিকার অমরত্ব। ইটারনেল লাইফ।

দৈত্যের মত একটা ট্রাক বাতাস কাঁপিয়ে শোঁ-শোঁ করে আসছে। হর্ন দিয়েছে। ওভারটেক করতে চায়। কয়েক মুহুর্তের জন্যে পাশার মনে হল, তার পুরনো মরিস মাইনরটি ট্রাকের গায়ে তুলে দিলে কেমন হয়? চিন্তাটা মুহূর্তের জন্যে হলেও এর জন্ম চেতনার গভীরে।

অমরত্বের পাশাপাশি সব মানুষের মধ্যেই বোধহয় থাকে মৃতের জন্যে আকাঙ্খা। মানুষের মত বিচিত্র প্রাণী কি আর আছে এই নক্ষত্রপুঞ্জের?

পাশা সরে গিয়ে ট্রাকটিকে পাস করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা করে দিল। ছুটন্ত দানবের গা থেকে বাতাসের ধাক্কা লাগল মরিস মাইনরে। পাশা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। আমাদের কর্মকাণ্ড সমস্তই অমরত্বের জন্যে। সবাই অবিনশ্বর হতে চাই। আমরা আমাদের ছায়া রেখে যেতে চাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে। মাইকেলেঞ্জেলদার পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামের অখ্যাত কারিগরও মাটির তাল হাতে নিয়ে মূর্তি গড়ে। এরা কেউ

থাকবে না। মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিড থাকবে। গ্রাম্য ভাস্করের মাটির মূর্তিটিও থাকবে। অমরত্ব। ইটারনেল লাইফ মাই ফুট।

পাশা বিড়বিড় করতে লাগল। সব কিছু তার কাছে কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। দু পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। বরফে ঢেকে আছে চারদিক। আকাশ ঝলমল করছে। অসংখ্য তারা আকাশে। নক্ষত্রের আলোয় বরফঢাকা প্রান্তর আলো হয়ে আছে। এই আলো মানুষের মনে শূন্যতাবোধ এনে দেয়। ভয় পাইয়ে দেয়।

পাশার গাড়ির বেগ বাড়তেই থাকল। পুরনো গাড়ি। ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। হাইওয়ে পেট্রলের কেউ এসে এক্ষুণি হয়তো আলো ফেলবে তার সাইড মিররে। গাড়ি থেকে নামিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে–এই লোকটি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে কি-না। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলবে, তুমি কত মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছ, তা কি জান?

জানি।

কেন চালাচ্ছ?

সে হেসে বলবে, নক্ষত্রের রাতে সব কেমন এলোমললা হয়ে যায় অফিসার।

অফিসার তাকাবে তীক্ষ্ণ চোখে। আমেরিকানরা হেঁয়ালি ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করে না।

২. হেক্টর এয়ারপোর্ট

হেক্টর এয়ারপোর্টের ওয়েটিং লাউঞ্জটি ছোট। কিন্তু এমন নিখুঁত ভাবে সাজান যে, ছবি মনে হয়। এখানে থাকা মানেই ছবির মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দেওয়া। রেবেকা তা করতে পারছে না। তার বারবার মনে হচ্ছে, তাকে এই জায়গায় মোটেই মানাচ্ছে না। সে জড়োসড়ো হয়ে কোণের দিকের একটি চেয়ারে বসে আছে। এবং প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর দরজার দিকে তাকাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে।

এ্যান চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ হল। বেশ মেয়েটি। হড়বড় করে অনেক কথা বলল। যাবার আগে অবিকল বাংলাদেশী মেয়ের মতো বলল, তোমার গলায় যে মালাটি আছে তা কিনতে তোমার কত টাকা লেগেছে? ডলারে কত হবে?

এক ভরি সোর সাধারণ একটা লকেট। কিন্তু এ্যান মুগ্ধ চোখে দেখছে। টাকাকে ডলারে এমন আগ্রহ নিয়ে কনভার্ট করছে যে, মনে হয় ভোর হওয়ামাত্র সে এরকম একটা লকেট কিনে আনবে। চমৎকার মেয়ে। বিদায় নেবার আগে রেবেকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আশ্চর্য কাণ্ড! অথচ এক বার জিজ্ঞেস করল না,আমেরিকায় তোমার ঠিকানা কী হবে? ঠিকানাটা দিয়ে যাও, পরে যোগাযোগ করব।

এত জায়গা থাকতে এক বুড়ো এসে বসল রেবেকার পাশের চেয়ারে। গায়ে গা লেগে যায়, এমন অবস্থা। বুড়োটি ক্রমাগত নাক ঝাড়ছে। নাক ঝাড়বার আগে এবং ২৫৬

পরে বিড়বিড় করে বলছে কোল্ড। ড্যাম কোল্ড। লোকটি অসম্ভব নোংরা এবং এমনভাবে নাক ঝাড়ছে যে গা শিরশির করে। রেবেকা বেশ কয়েক বার ভেবেছে একটু দূরে অন্য একটা চেয়ারে সরে বসে। এটা অভদ্রতা হবে ভেবে সে করছে। না।

লাউঞ্জে লোকজন একেবারেই নেই। দু জন বিশালবপু মহিলা একগাদা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে অনবরত কথা বলছে। এরা আমেরিকান নয়। কথাবার্তা শালিক পাখির কিচিরমিচিরের মত। বাচ্চাগুলি ভেণ্ডিং মেশিনে পয়সা ফেলে কিছুক্ষণ পরপরই খাবারদাবার নিয়ে ছুটে আসছে। এই আইসক্রীম, এই অরেঞ্জ জুস, এই একটা স্যাণ্ডউইচ। এত রাতে ছেলেগুলির পেটে রাক্ষসের মতো খিদে কেন? একটা পুতুলের মতো বাচ্চা, সবেমাত্র হাঁটতে-শিখেছে সেও একটা-কী কিনে এনে চারিদেকে ছড়াচ্ছে। বাচ্চার মা দেখেও দেখছে না। হাত নেড়ে-নেড়ে বারবার বলছে-উইইএ উইইএ্যা উইইএ মানে কী? কোন দেশী ভাষা।

বুড়োলোকটি থলথলে চোখে কাল রেবেকার দিকে। তার একটি চোখ লাল হয়ে আছে। চোখের কোণে ময়লা।

তুমি কি ভারতীয়?

রেবেকা মাথা নাড়ল। যার মানে যা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

যে ডেসটি পরে আছ তার নাম কি সারি?

হ্যাঁ শাড়ি।

ঠাণ্ডা লাগছে না তোমার?

না।

ঠাণ্ডা লাগাবার কথা। খুবই পাতলা কাপড় মনে হচ্ছে, ভেরি থিন।

রেবেকা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এখন হয়তো হাত বাড়িয়ে সে শাড়ি পাতলা কি মোটা দেখতে চাইবে।

বুড় প্রচণ্ড শব্দে নাক ঝাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, কোল্ড, ড্যাম কোল্ড।

রেবেকার ঠাণ্ডা লাগছে না। তার চেতনা কিছু পরিমাণে অসাড় হয়ে আছে। খিদে লাগার কথা, খিদেও লাগছে না। জীবনের উপর দিয়ে ছোটখাট একটা ঝড় বয়ে গেছে। এত বড় অনিশ্চয়তায় সে কখনো পড়ে নি।

অথচ প্লেনে ওঠার সময় কত বড় বড় কথা একেক জনের। ভয়ের কিছুই নেই। ঢাকা থেকে কুমিল্লা যেতে যে-ঝামেলা তার দশ ভাগের এক ভাগ ঝামেলা ঢাকা থেকে নিউইয়র্ক যেতে। ওঠা আর নামা–ব্যস। এক জন অন্ধকে প্লেনে বসিয়ে দিলে সে যেখানে যাবার ঠিক চলে যাবে।

চাঁদপুরের ঘোটখালু বললেন, তাঁর অফিসের নেজাম সাহেবের এগার বছরের ভাগ্নিকে তারা টিকিট কেটে প্লেনে তুলে দিয়েছেন, সে একা-একা চলে গেছে ভ্যাঙ্কুর। পথে সিয়াটলের এয়ারপোর্ট হোটেলে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার হিসেবে এক রাত থেকেছে।

ছোটখালু খুব হাতটাত নেড়ে বললেন, এগার বছরের মেয়ের যদি অসুবিধা না হয়, তোর হবে কেন? তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন বোকার মতো।

জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে নামবি। ইমিগ্রেশন পার করবি, তারপর গাঁটগ্যাঁট করে হেঁটে চলে যাবি ডোমস্টিক ফ্লাইট সেকশনে। আবদুল সেখানে থাকবে। সে তোক ফার্গোর প্লেনে তুলে দেবে।

আবদুল চাচা যদি না থাকে?

না থাকলে জিজ্ঞেস করবি ফার্গো যাবার প্লেন কত নম্বর থেকে ছাড়ে। জিজ্ঞেস করবি, ফ্লাইট নাম্বার এন ডাবলিউ টু টু ওয়ান কোত্থেকে ছাড়বে। আর আবদুল থাকবেই। ওর একটা দায়িত্ব নেই?

আবদুল চাচার যতটা দায়িত্ব থাকবে আশা করা গিয়েছিল, ততটা দায়িত্ব তাঁর ছিল না। তিনি আসেন নি এবং রেবেকা পুরোপুরি দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল–

এয়ারপোর্টের মত একটা ব্যাপার এত বিশাল হতে পারে।

হাজার হাজার মানুষ। সবাই ব্যস্ত। সবাই ছুটছে। যেন কোথাও কোনো আগুন লেগেছে, এই মুহূর্তে পালিয়ে যেতে হবে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে অনবরত ঘঘাষণা দেওয়া হচ্ছে–এ্যাটেনশন প্লীজ। ফ্লাইট নাম্বার টু টু ওয়ান.....

মাথার উপরে সারি সারি টিভি ঝুলছে, তার একটির লেখার সঙ্গে অন্যটির কোন মিল নেই। বুড়োবুড়ির বিরাট একটি দল ক্লান্ত ভঙ্গিতে ভারি ভারি মালপত্র টেনে-টেনে আনছে। এত রঙচঙ তাদের পোশাকে যে চোখ ধাধিয়ে যায়। তারা বারবার একই জায়গায় ঘোরাফেরা করছে।

কয়েক জন তরুণ-তরুণী লোকজনের ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছে। একটি দাড়িওয়ালা ছেলের চুমু খাওয়ার ভঙ্গি এতই অশ্লীল যে রেবেকার গা কাঁপতে লাগল। ছেলেটি তার একটি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে মেয়েটির প্যান্টের ভেতর। কেউ তা দেখেও দেখছে না।

রেবেকার নিশ্চিত ধারণা হল, সে এই জীবনে ফ্লাইট নাম্বার এন ডাবলিউ টু টু ওয়ান খুঁজে বের করতে পারবে না। সে বেশ কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করল। সবাই বলল, আমি জানি না। এক জন বলল, তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না। আবার বল।

রেবেকা আবার বলল। লোকটি মাথা ঝাকাল।

উঁহুঁ। বুঝতে পারছি না, আবার বল। ধীরে ধীরে বল, এত ছটফট করছ কেন?

ছোটখালু বলে দিয়েছিলেন, কোনোই ঝামেলা হবে না, বুঝলি। ঐটা কোনো ঝামেলার দেশই না। তবু খোদা না খাস্তা যদি কিছু হয়, স্ট্রেইট পুলিশের কাছে গিয়ে বলবি–হেল্প মি প্লীজ। দেখবি সব ফয়সালা। ওদের পুলিশ আমাদের পুলিশের মতো নয়। ওরা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। দি বেস্ট ফ্রেণ্ড।

ছোটখালু এমনভাবে কথা বলেন, যেন বিদেশের সব কিছু তাঁর জানা। যেন অসংখ্য বার ঘুরেটুরে এসেছেন। অথচ তার সবচেয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ হচ্ছে চাঁদপুর থেকে লালমনিরহাট। সেই লালমনিরহাট যেতেই কত কাণ্ড। ভুল ট্রেনে উঠে বসে আছেন। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, লাফিয়ে নামতে গিয়ে চশমা ভেঙে ফেললেন। হাঁটুতে চোট পেলেন।

এত দুঃখেও ছোটখালুর কথা মনে করে তার হাসি পেল। কত সুখের, কত আনন্দের দেশ ছেড়ে কোথায় এলাম ভেবে পরক্ষণেই তার বুক ব্যথা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত এক পুলিশকেই জিজ্ঞেস করল। সেই পুলিশের পর্বতের মতো চেহারা। কোমরের দুই দিকে দুটি পিস্তল ঝুলছে। ওয়েস্টার্ন ছবিতে যেরকম দেখা যায় অবিকল সেরকম। সে দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এই প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞেস না করে নর্থ ওয়েস্ট অরিয়েন্টের ইনকোয়েরিকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়। ওদের জানার কথা, আমার নয়।

তাদের কোথায় পাব?

কি বলছ বুঝতে পারছি না, আবার বল।

তাদের কোথায় পাব?

কাদের কোথায় পাবে? যা বলতে চাও গুছিয়ে বল। তুমি কী জানতে চাও, তা তুমি নিজেও ভালো জান না।

এয়ারপোর্ট থেকে সে কোনো দিন বের হতে পারবে, এই আশা রেবেকা প্রায় ছেড়েই দিল। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। হয়তো কেঁদেও ফেলত, যদি না এক জন নিগ্রো যুবক এসে বলত, তোমার কী অসুবিধা আমাকে বল। এরকম করছ কেন?

আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

যাবে কোথায় তুমি? তোমার জিনিসপত্র আছে? টিকিট আছে? টিকিটটা কোথায় আমার কাছে দাও।

ছোটখালু বারবার বলে দিয়েছেন, ব্ল্যাকদের কাছ থেকে সাবধান থাকবি। দেখবি অনেকে যেচে সাহায্য করতে আসবে। তুই মুখের উপর স্ট্রেইট বলবি–নো, থ্যাংকস। আমেরিকার ক্রাইম ওয়ার্লডটা হচ্ছে ওদের হাতে। ইটালিতে যেমন মাফিয়া, আমেরিকাতে তেমনি ব্ল্যাক। হাড়ে-হাড়ে শয়তান। মহা পাজি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসন নামের তালগাছের মত লম্বা কালে ছেলেটি তাকে নিয়ে গেল একটি নাম্বার ইলেভেনে। বোর্ডিং কার্ড করিয়ে দিয়ে কোমল স্বরে বলল, এগার নম্বর দেখে দেখে চলে যাও। আর কোন প্রবলেম হবার কথা নয়।

থ্যাংকস দিতে গিয়ে রেবেকার গলা জড়িয়ে গেল। ছেলেটি বলল, টেক কেয়ার অব ইয়োরসেলফ। এই বলেই সে তার বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল। হাত বাড়ান হয়েছে হ্যাণ্ডশেকের জন্য, এটা বুঝতে অনেক সময় লাগল রেবেকার।

অনেকক্ষণ রেবেকার হাত ঝাকাল ছেলেটি। কিংবা হয়ত অল্পক্ষণই অসংখ্য বার ঘুরেটুরে এসেছেন। অথচ তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ হচ্ছে চাঁদপুর থেকে লালমনিরহাট। সেই লালমনিরহাট যেতেই কত কাণ্ড! ভূল ট্রেনে উঠে বসে আছেন। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, লাফিয়ে নামতে গিয়ে চশমা ভেঙে ফেললেন। হাঁটুতে চোট পেলেন।

এত দুঃখেও ছোটখালুর কথা মনে করে তার হাসি পেল। কত সুখের, কত আনন্দের দেশ ছেড়ে কোথায় এলাম ভেবে পরক্ষণেই তার বুক ব্যথা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত এক পুলিশকেই জিজ্ঞেস করল। সেই পুলিশের পর্বতের মতো চেহারা। কোমরের দুই দিকে দুটি পিস্তল ঝুলছে। ওয়েস্টার্ন ছবিতে যেরকম দেখা যায় অবিকল সে-রকম। সে দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

এই প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞেস না করে নর্থ ওয়েস্ট অরিয়েন্টের ইনকোয়েরিকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়। ওদের জানার কথা, আমার নয়।

তাদের কোথায় পাব?

কি বলছ বুঝতে পারছি না, আবার বল।

তাদের কোথায় পাব?

কাদের কোথায় পাবে? যা বলতে চাও গুছিয়ে বল। তুমি কী জানতে চাও, তা তুমি নিজেও ভালো জান না।

এয়ারপোর্ট থেকে সে কোন দিন বের হতে পারবে, এই আশা রেবেকা প্রায় ছেড়েই দিল। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। হয়তো কেঁদেও ফেলত, যদি না এক জন নিগ্রো যুবক এসে বলত, তোমার কী অসুবিধা আমাকে বল। এরকম করছ কেন?

আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

যাবে কোথায় তুমি? তোমার জিনিসপত্র আছে? টিকিট আছে? টিকিটটা কোথায় আমার কাছে দাও।

ছোটখালু বারবার বলে দিয়েছেন, ব্ল্যাকদের কাছ থেকে সাবধান থাকবি। দেখবি অনেকে যেচে সাহায্য করতে আসবে। তুই মুখের উপর স্ট্রেইট বলবি–নো, থ্যাংকস। আমেরিকার ক্রাইম ওয়ার্লডটা হচ্ছে ওদের হাতে। ইটালিতে যেমন মাফিয়া, আমেরিকাতে তেমনি ব্ল্যাক। হাড়ে-হাড়ে শয়তান। মহা পাজি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসন নামের তালগাছের মতো লম্বা কালো ছেলেটি তাকে নিয়ে গেল একটি নাম্বার ইলেভেনে। বোর্ডিং কার্ড করিয়ে দিয়ে কোমল স্বরে বলল, এগার নম্বর দেখে দেখে চলে যাও। আর কোনো প্রবলেম হবার কথা নয়।

থ্যাংকস দিতে গিয়ে রেবেকার গলা জড়িয়ে গেল। ছেলেটি বলল, টেক কেয়ার অব ইয়োরসেলফ। এই বলেই সে তার বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল। হাত বাড়ান হয়েছে হ্যাণ্ডশেকের জন্য, এটা বুঝতে অনেক সময় লাগল রেবেকার।

অনেকক্ষণ রেবেকার হাত ঝাকাল ছেলেটি। কিংবা হয়তো অল্পক্ষণই ঝাঁকিয়েছে–রেবেকার মনে হয়েছে অনন্তকাল। কী বিশাল হাত। কিন্তু কেমন মেয়েদের মধ্যে তুলতুলে। ছেলেটি আবার বলল, টেক কেয়ার অব ইয়োরসেলফ।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। কোনো দিনই আর তার সঙ্গে দেখা হবে না।

এন ডাবলিউ টুটু ওয়ান আকাশে উড়তে শুরু করেছে। এক নিরুদ্দেশ থেকে অন্য এক নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা। বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে কান্না উঠে আসছে। শুধুই বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

এক দঙ্গল মানুষ এসেছিল এয়ারপোর্টে, সবাই এমন কান্নাকাটি শুরু করল, যেন তাদের এই মেয়ে কোনো দিন দেশে ফিরে আসবে না। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, কী শুরু করলে তোমরা? তিন মাসের জন্য যাচ্ছে, আর সবাই মরাকান্না শুরু করলে? কোনো মানে হয়? বলেই নিজেই চোখ মুছতে শুরু করলেন।

বড় দুলাভাই বললেন, ওকে নাসিমের সঙ্গে একা থাকতে দাও না, তোমরা সবাই একটু এদিকে আস তো নাসিম অনেকটা দূরে একা-একা দাঁড়িয়ে ছিল। বড় দুলাভাই তাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে বিয়ের পাঞ্জাবিটা পরে এসেছে। পাঞ্জাবি মাপমতো হয় নি, বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছে। সেই লম্বা পাঞ্জাবিতেই এত সুন্দর লাগছে তাকো নাসিম লাজুক ভঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়াল। সবাই তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এইভাবে কোন কথা বলা যায়? কিন্তু কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না করছিল কথা বলতে। রেবেকা শেষ পর্যন্ত বলল, এই পাঞ্জাবিটা পরতে না করলাম, তার পরও কেন পরলে?

সে কোন কথা বলল না। লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। রেবেকা থেমে-থেমে। বলল, আজ রাতেই তুমি কিন্তু আমাকে চিঠি লিখবে।

হ্যাঁ লিখব। আজ রাতেই লিখব।

এত লোকজন তার চার পাশে, তবু সবাইকে ছাড়িয়ে সাত দিন আগের পরিচিত এই মানুষটিই কেন প্রধান হয়ে উঠলঃ সাত দিন আগে তো সে কোন দিন একে দেখে নি। রাতের বেলা যেসমস্ত কল্পনার মানুষদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলত, এদের কারো সঙ্গেই এই লোকটির কোন মিল নেই। তার চেহারা সাধারণ। কথাবার্তা সাধারণ। পোশাকআশাকও সাধারণ। তবু কেন মনে হচ্ছে সুদূর কৈশোরে যাকে সে ভেবেছে– সে-ই, অন্য কেউ নয়, দীর্ঘ দিনের চেনা এক জন?

রেবেকা গাঢ় স্বরে বলল, যাই। নাসিম হাসল।

আশেপাশে কেউ না থাকলে নিশ্চয়ই সে এগিয়ে এসে হাত ধরত। বেচারা বড্ড লাজুক। কিসের এত লজ্জা মা, বাবা, ভাই, বোন যদি সবার সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারে, সে কেন সামান্য হাতটা ধরতে পারবে না? এত জঘন্য কেন আমাদের দেশ?

কাঁদবে-না কাঁদবে-না ভেবেও রেবেকা কেঁদে ফেলল। নাসিম বলল, ছিঃ ছিঃ, কী করছ? দুদিন পর তো এসেই পড়বে।

রেবেকা ধরা গলায় বলল, তোমাকে এত বক্তৃতা দিতে হবে না। চুপ করে থাক।

রেবেকার পাশের সীটের মহিলাটি পাখির মত গলায় বলল, আমেরিকায় এই প্রথম আসছ?

হ্যাঁ।

খুব হোমসিক ফিল করছ, তাই না?

হ্যাঁ।

হোমসিকনেস থাকবে না, কেটে যাবে। এ দেশে এসে কেউ হোমসিক হয়। না।

আত্মতৃপ্তির হাসি আমেরিকানটির মুখে। সে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান দিচ্ছে।

কিন্তু এই স্বর্গরাজ্যে যেতে ইচ্ছে করছে না। এ রকম যদি হত যে এটা একটা স্বপ্ন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে এবং রেবেকা দেখবে যে তার পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছে। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে। বৃষ্টির ছাটে তার বিছানা ভিজে গেছে। কিন্তু তা হবে না। এটা স্বপ্ন নয়। এটা সত্যি।

এয়ারহোস্টেস এসে রাতের খাবার দিয়ে গেল। প্রতিটি জিনিসই দেখতে এত সুন্দর, কিন্তু খেতে এত জঘন্য। বমি এসে যায়।

তোমার কি কোনো ড্রিংক লাগবে?

না।

ভালো শেরী আছে, পর্তুগালের।

না, আমার লাগবে না। আর আমি এসব কিছুই খাব না। নিয়ে যাও।

তুমি কি অসুস্থ?

না। আমি ভালেই আছি।

রেবেকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অনেক উঁচুতে প্লেন। নিচের কিছুই দেখা যায় না। ঘঘালাটে একটি চাদরে পৃথিবী ঢাকা।

এত কুৎসিত, এত কুৎসিত।

৩. পাশা লাউঞ্জের এক প্রান্তে

পাশা লাউঞ্জের এক প্রান্তে ঘুমিয়ে-থাকা মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অবাক হবার মূল কারণ মেয়েটির সৌন্দর্য নয়। চেহারা সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত। শ্যামলা রঙ, বৃত্তাকার মুখ। চাপা নাক। এশীয় মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত কারণে যে-কোমল ভাব থাকে, তা অবশ্যি আছে।

পাশা অবাক হয়েছে, কারণ মেয়েটির গায়ে আসমানী রঙের শাড়ি আর সোয়েটারটির রঙ লাল। মাথায় জড়ান মাফলারটি ধবধবে সাদা রঙের। যা কল্পনা করা হয়েছিল, তাই।

কাকতালীয় যোগাযোগ, বলাই বাহুল্য। হঠাৎ করে মিলে যাওয়া। তবু কিছুটা কি রহস্যময় নয়? কল্পনার সঙ্গে বাস্তব এতটা কি কখনো মেলে? প্রবাবিলিটি অবশ্যি সব কিছুরই থাকে। তবু সেই প্রবাবিলিটি কি খুব কম নয়?

পাশা নিঃশব্দে মেয়েটির চেয়ারের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বেচারি আমেরিকা আসার উত্তেজনায় নিশ্চয়ই ক রাত ঘুমাতে পারে নি। প্লেনে ঘুমানর প্রশ্নই ওঠে না। এখানে তাই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। কেমন অসহায় লাগছে। মেয়েটিকে। এত কমবয়সী একটি মেয়ে একা-একা চলে এসেছে এত দূর? আশ্চর্য তো! ঘুমাক খানিকক্ষণ। এই ফাঁকে আরেক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে। পাশা ভেণ্ডিং মেশিনের দিকে এগিয়ে গেল।

পৃথিবীর কুৎসিততম পানীয়ের একটি হচ্ছে ভেণ্ডিং মেশিনের কফি। পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে বিস্বাদ খানিকটা গরম পানি গেলার কোন অর্থ হয় না। তবু ভেণ্ডিং মেশিন দেখলেই সবার পয়সা ফেলে কিছু কিনতে ইচ্ছা করে।

ফরিদের এ ব্যাপারে একটা থিওরি আছে। তার বিখ্যাত এ্যানালাইটিক্যাল রিজনিং। যন্ত্র মানুষকে খাবার দিচ্ছে, এটা অদ্ভুত ব্যাপার। যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারে মানুষ কৌতূহলী। এই কৌতূহলের কারণেই ভেণ্ডিং মেশিন দেখামাত্র লোকে পয়সা ফেলে। যার কফি খাবার কোনোই ইচ্ছা নেই, সেও কফি কেনে এবং দু চুমুক দিয়ে কাগজের কাপটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আজকের কফি খারাপ নয়। টাটকা এক গন্ধ। তিতকুটে কোনো ভাব নেই। এক চুমুক দেবার পর দ্বিতীয় চুমুক দেবার ইচ্ছা হয়। পাশা কফির কাপ হাতে নিয়ে রেবেকার সামনের চেয়ারটায় বসল।

কল্পনার তিনটি রঙ কীভাবে বাস্তবের তিন রঙের সঙ্গে মিলে গেল, এই নিয়ে ফরিদের মতো খানিকক্ষণ এ্যানালাইটিক্যাল রিজনিং করলে কেমন হয়?

সোয়েটারের রঙ লাল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এশিয়ান মেয়েরা লাল রঙ পছন্দ করে। ওদের গরম কাপড়ের শতকরা আশি ভাগ হচ্ছে লাল। যেমন আমেরিকান মেয়েদের পছন্দের রঙ হচ্ছে গোলাপী।

মাফলার সাদা রঙের হবার কারণ হচ্ছে–মাফলারটি বানান হয়েছে সোয়েটার কেনার পর, রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। লালের সঙ্গে দুটি কম্বিনেশন চলে–একটি হচ্ছে কালো, অন্যটি সাদা। কালো মেয়েদের অপছন্দের রঙ, কাজেই মাফলার বানান হল সাদা রঙের।

রাত দুটো দশ মিনিটে অকারণে তার ঘুম ভাঙার রহস্য পরিষ্কার হল। এ্যান নামের মেয়েটি নিশ্চয় তাকে বেশ কয়েক বার টেলিফোন করেছে। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙেছে। যখন সে জেগে উঠছে তখন আর টেলিফোন বাজছিল না। এ্যান ২৬২

লাইন কেটে দিয়ে আবার করেছে।

পাশা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে আজকাল এত ভাবছে। কেন? এটা কি বয়সের লক্ষণ? নাকি মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে?

ফরিদের মতো একদিন মাঝরাতে সেও কি ছুটে রাস্তায় নেমে চেঁচাতে শুরু করবে– নিউক্লিয়ার ওয়ার হ্যাজ স্টার্টেড। এটেনশন এভরিবডি, নিউক্লিয়ার ওয়ার।

কী কাণ্ড সেই রাতে। ডরমিটারির অর্ধেক ছাত্র বের হয়ে এল। কৌতূহলী হয়ে দেখল দৃশ্যটি। তারপর আবার যে যার কাজে চলে গেল। টার্ম ফাইন্যাল সামনে। তামাশা দেখার সময় নেই। রাতদুপুরে একটি কালো চামড়ার ছেলে যদি চেঁচামেচি শুরু করে, তাতে কিছুই আসে যায় না। হয়তো মদ খেয়ে আউট হয়ে গেছে কিংবা......

রেবেকা অবাক হয়ে লোকটিকে দেখছে। ইনিই বোধহয় পাশা চৌধুরী। এমন চেনা-চেনা লাগছে কেন? চিবুকের গড়ন অবিকল ছোটমামার মত। মাঝবয়েসী। এক জন ভদ্রলোক। টেলিফোনে গলা শুনে কমবয়েসী মনে হয়েছিল। রেবেকা ভেবেছিল ইউনিভার্সিটির কোনো ছাত্র। কিন্তু এর বয়স খুব কম হলেও চল্লিশ। জুলপির কাছের চুল সাদা হয়ে আছে। লোকটি মূর্তির মত বসে আছে। বেশ কয়েক বার রেবেকার চোখে তার চোখ পড়ল, কিন্তু

লোকটি যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে আছে। যেন এ জগতের কোনো কিছুর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। কোথায় যেন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী একটা ভাব আছে এর মধ্যে।

পাশা হঠাৎ লক্ষ করল, মেয়েটি জেগে উঠেছে। অস্বস্তির সঙ্গে তাকাচ্ছে তার দিকে। পাশা এগিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, অনেকক্ষণ হল এসেছি। তুমি ঘুমাচ্ছিলে দেখে ডাকি নি।

রেবেকা কী বলবে ভেবে পেল না। প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা, অত্যন্ত সুপুরুষ এক জন অচেনা মানুষ তার সঙ্গে চেনা ভঙ্গিতে কথা বলছে।

পাশা বলল, চল যাই।

কোথায় যাব?

প্রথমে আমার বাসায় চল। রাত কাটে নি এখনো। এ সময় তো কাউকে পাওয়া যাবে না। ভোরবেলা খোঁজখবর করব। তোমার সুটকেসের পাত্তা পাওয়া গেছে?

না।

কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে, পরে খোঁজ নেব। চল যাওয়া যাক। খুব নাকি কাঁদছিলে তুমি?

লোকটি হাসছে মিটিমিটি। যেন সে রেবেকার কোনো গোপন দুষ্টুমি ধরে ফেলেছে। কথা বলছে তুমি-তুমি করে। কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না মোটও।

নাও, এই কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নাও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।

রেবেকা ক্ষীণ স্বরে বলল, বরফ পড়ছে নাকি?

না, পড়ছে না। তবে চারদিকে প্রচুর বরফ আছে। বরফ দেখার শখ তোমার মিটে যাবে।

বাইরে বেরুতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝাপটা লাগল। কী প্রচণ্ড শীত। পায়ের নিচে আয়নার মত মসৃণ কঠিন বরফ। পা বারবার পিছলে যাচ্ছে। পাশা বলল, বরফের ওপর হাটতে হবে খুব সাবধানে। প্রচুর আমেরিকান বরফে পিছলে পা ভাঙে, কাজেই আমাদের অবস্থা বুঝতেই পারছ। প্রথম ফেলবে পায়ের গোড়ালি এবং লম্বা স্টেপ নেবে না। ছোট ছোট পা ফেলবে। নাও, আমার হাত ধর।

রেবেকা হাত ধরল।

এটা কি ঠিক হচ্ছে? অজানা-অচেনা এক জন মানুষের হাত ধরেছে। কিন্তু খারাপ লাগছে না তো! নাসিম শুনলে কি রাগ করবে? নিশ্চয়ই করবে। পুরুষমানুষেরা খুব জেলাস হয়।

রেবেকা।

জ্বি।

প্রথম কিছু দিন হাইহিল পরবে না। আগে বরফে হাঁটার অভ্যেস হোক, তারপর। তোমার হিল পরার দরকারই-বা কী, তুমি তো যথেষ্ট লম্বা।

ক্লাসের মেয়েরা আমাকে কী বলে ক্ষেপাত, জানেন?

না।

ওরা আমাকে দেখলেই বলত–ঐ দেখা যায় তালগাছ, ঐ আমাদের গ.. পাশা শব্দ করে হাসল। বেশ রসিক মেয়ে।

গাড়ি ছুটছে প্রচণ্ড বেগে। রেবেকা চুপচাপ বসে আছে। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার যে মেঘ তাকে ঘিরে ছিল, তা কেটে যেতে শুরু করেছে। কোথাও যেন একটি নির্ভরতার ব্যাপার আছে। রেবেকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। গাড়ির ভেতর আরামদায়ক উষ্ণতা।

রেবেকার জেগে থাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু জেগে থাকতে পারছে না। বারবার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন। গাড়ির কাঁচ ওঠান। সিগারেটের ধোঁয়ায় বমি এসে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে নিশ্চয়ই বলা যাবে না–সিগারেট ফেলে দিন। নাসিমেরও এ রকম অভ্যাস। ঠিক ঘুমাতে যাবার আগে মশারির ভেতর ঢুকে একটা সিগারেট টানবে। সেই কড়া গন্ধ মশারির ভেতর আটকে থাকবে সারা রাত। অভ্যাসটা প্রায় কাটিয়ে এনেছিল, এখন সে নিশ্চয়ই আবার শুরু করবে এবং এক দিন বিছানায় আগুনাগুন লাগিয়ে একটা কাণ্ড করবে। রেবেকা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

৪. রেবেকা বুঝতেই পারল না

চোখ মেলে রেবেকা বুঝতেই পারল না সে কোথায়। তার চারদিকে অপরিচিত গন্ধ। অপরিচিত অদ্ভুত শব্দ। সে কি তার নানার বাড়িতে? যে-কোন অচেনা জায়গায় ঘুম ভাঙলেই প্রথম যে-জিনিসটি তার মনে আসে, সেটা হচ্ছে–এটা কি নানার বাড়ি? ব্রহ্মপুত্রের উড়ে-আসা হওয়ায়-ভর্তি একটি প্রাচীন কোঠায় তার ঘুম ভাঙলঃ বিছানার চাদরটি কপূরের গন্ধমাখা, পায়ের কাছে বিশাল কোলবালিশ। রেলিং দেওয়া ঘন কালো রঙের খাটটাকে সব সময়ই মনে হত সমুদ্রের মতো বিশাল।

এটা নানার বাড়ি নয়। এর সব কিছুই অদ্ভুত। হোস করে একটা শব্দ হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে শো-শোঁ আওয়াজ। আবার খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। আবার হোস করে শব্দ।

রেবেকা উঠেবসল। মাঝারি ধরনের একটা ঘর। দুদিকের দেয়াল জুড়ে পর্দাঢাকা বিশাল কাঁচের জানালা। পর্দার রঙ হালকা সবুজ। ঘরের দেয়ালের রঙ ধবধবে সাদা, যেন কিছুক্ষণ আগে কেউ এসে চুনকাম করে গিয়েছে। মেঝেতে গাঢ় সবুজ রঙের শ্যাগ কার্পেট। নতুন দূর্বাঘাসের মতো কোমল। পা রাখতে মায়া লাগে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। এক পাশে ছোট্ট একটা লেখার টেবিল টেবিলের ওপর অদ্ভুত ডিজাইনের একটি টেবিলল্যাম্প। এত সুন্দর হয় মানুষের ঘর: রেবেকা উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরাল। যত দূর চোখ যায়–বরফ-সাদা প্রান্তর। বা পাশে পুতুলের বাড়ির মত এক সারি বাড়ি। হঠাৎ করে স্বপদৃশ্যের মতো লাগে। স্বপ্নের সব সুন্দর ছবিই মন খারাপ করে দেয়। এটিও দিচ্ছে। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে রেবেকার, কান্না পেয়ে যাচ্ছে। সে তাহলে আমেরিকায় এসে পড়েছে? তার চোখের সামনে আমেরিকা?

বাসায় যেদিন খবর নিয়ে এল সে তিন মাসের ট্রেনিং-এ যাচ্ছে, কেউ প্রথমে বিশ্বাস করল না। বাবা বললেন, সত্যি-সত্যি কোনো চান্স আছে? রেবেকা বলল, আমি একুশ তারিখ যাচ্ছি। চিঠি পড়ে দেখা বাবা সেই চিঠি প্রায় দশ বার পড়লেন এবং হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। উত্তেজনায় তার মাথা ধরে গেল, তিনি দুই হাতে কপালের রগ টিপে ধরে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। মা অবাক হয়ে বললেন, কী লিখেছে চিঠিতে? রেবা সত্যি যাচ্ছে? পড় না শুনি।

বাবা বললেন, একুশ তারিখ রওনা হতে হবে।

কোন মাসের একুশ তারিখ?

এই মাসের। আবার কোন মাসের?

কী উত্তেজনা চারদিকে। মা গুটিসুটি অক্ষরে তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখলেন–র সংবাদ এই যে, রেবা স্কলারশিপ লইয়া আমেরিকা যাইতেছে। তাহার যাত্রার দিন ধার্য হইয়াছে এই মাসের একুশ তারিখ। সে ইতিমধ্যেই তিসার

জন্য গিয়াছে। ভিসার জন্য চার তারিখে ইন্টারভিউ হইবে। তবে স্কলারশিপ আমেরিকা সরকারের, কাজেই ভিসা পাওয়া ইনশা আল্লাহ্ কোনো সমস্যা হইবে না।...

রেবেকা এক দিনেই বাসার অন্য সবার চেয়ে আলাদা হয়ে গেল। সবাই সমীহ করে কথা বলে। সামনের বাসার জজ সাহেব পর্যন্ত এক দিন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অনেক গল্প করলেন।

শুনলাম, আমেরিকা যাচ্ছ?

জ্বি-চাচা।

গুড, ভেরি গুড। কোন স্টেট?

নর্থ ডাকোটা।

নর্থ ডাকোটায় যাই নি কখনো। সাউথ ডাকোটায় গিয়েছিলাম। মাউন্ট রাশমূর দেখতে। চার প্রেসিডেন্টের মূর্তি আছে পাহাড়ের গায়ে–পাথর কেটে করা। মূর্তির নাকই হল গিয়ে তোমার আট মিটার। যাচ্ছ কবে?

একুশ তারিখে।

কোন এয়ারলাইনস?

তা এখনো জানি না চাচা। টিকেট হয় নি এখনো।

ভালো ভালো। খুব খুশির সংবাদ।

তাঁর মুখ দেখে অবশ্যি মনে হয় না তিনি খুশি হয়েছেন, কিন্তু মার মুখ দেখে। যে-কেউ বলে দিতে পারে, বড়ো একটা সুখের ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে। এই ঘটনাটা পরিচিত অপরিচিত কাউকে জানাতেও তিনি কখনো দেরি করেন না। এত আচমকা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন যে রীতিমতো লজ্জা লাগে। হয়তো দোকানে কিছু একটা কিনতে গিয়েছে রেবেকা, সঙ্গে মা আছেন। জিনিসটি পছন্দ হয়েছে, এখন কেনা হবে। মা বলে বসবেন, খামাখা এত দাম দিয়ে এটা কেনার কোনো মানে হয়? ছ দিন পর আমেরিকা যাচ্ছি। সেখানে কিনে নিবি, সস্তায় পাবি।

রেবেকা বুঝতে পারে, মা মনে-মনে অপেক্ষা করেন–দোকানী বলবে, আমেরিকা যাচ্ছে বুঝি? কবে? বেশির ভাগ দোকানী কোনো রকম আগ্রহ দেখায় না। দু-এক জন অবশ্যি জিজ্ঞেস করে। তাদের দোকান থেকে মা কিছু-না-কিছু। কিলবেনই। যাবার সময় হাসিমুখে বলবেন, আচ্ছা, তাহলে যাই রে ভাই।

কী উত্তেজনার দিনই না গিয়েছে। কুমিল্লা থেকে বড় দুলাভাই তার নামে এক হাজার টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন। কুপনে লেখা–বিদেশ যাবার আগে যদি টুকিটাকি কিছু কেনার দরকার হয় সেই জন্যে। টাকা পাঠানটা দুলাভাইয়ের নতুন ব্যাপার নয়। কোনো একটা কিছু হলেই দুলাভাইয়ের কাছ থেকে টাকা চলে আসবে। টুটুল ক্লাস সিক্সে বৃত্তি পেল। দুলাভাই এক শ টাকা পাঠালেন। ফরিদা একটা লেটার পেয়ে ফাস্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করল, দুলাভাইয়ের মানিঅর্ডার চলে এল।

তারা কত বার বলেছে, শুধু টাকা পাঠান কেন দুলাভাই, এটা-সেটা কিনে পাঠাবেন।

কী কিনব বল? কিছুই মনে ধরে না।

আপনার মনে ধরার দরকার কি? আপাকে সঙ্গে নিয়ে কিলবেন।

আচ্ছা, পরের বার থেকে তাই করব।

দুলাভাই লোকটা বোকাসোকা ধরনের। থলথলে মোটা, বিয়ের এক বছরের মধ্যে বেশ উঁচু একটা ভুড়ি বাগিয়ে ফেললেন। সেই ভুড়ি নিয়ে খালিগায়ে শস্ত্রবাড়ির রান্নাঘরে শাশুড়ির পাশে বসে মাছ কাটা দেখেন, তালপাতার হাওয়া খেতে খেতে সস্তা ধরনের রসিকতা করেন। সেই রসিকতা শুনে মা হেসে বাচেন না। আপা কত বার বলে, খালিগায়ে তুমি বাবা-মার সামনে ওভাবে চলাফেরা কর, ছিঃ ছিঃ।

কী করব বল, গরম লাগে।

গরম লাগে, ফ্যানের নিচে বসে থাক। রান্নাঘরে বসে আছ কেন?

গল্পগুজব করবার জন্যে বসি। রাগ কর কেন?

বাবুকে কোলে নিয়ে বসার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বস তো, প্লীজ।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, যাচ্ছি। লেবুর সরবত বানিয়ে পাঠাও তো। গরমটা কাবু করে ফেলছে।

এখন লেবুর সরবত বানান যাবে না। লেবু নেই ঘরে।

মা সঙ্গে সঙ্গে টুটুলকে পাঠাবেন লেবু কিনতে। দুলাভাইয়ের মুখের কথা এ বাড়িতে অমোঘ আদেশ। বাবা-মা দুজনেই দুলাভাইকে জিজ্ঞেস না-করে কিছু করতে পারেন না। ফরিদা সায়েন্স পড়বে না আর্টস পড়বে? দুলাভাইয়ের কাছে। চিঠি গেল। তিনি যা বলবেন তাই। টুটুল সাইকেল কিনবে। বাবা কিছুতেই দেবেন। না। তার ধারণা, সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরলেই এ্যাক্সিডেন্ট হবে। টুটুল কুমিল্লায় গিয়ে দুলাভাইকে ধরল। তিনি চিঠি লিখে দিলেন। টুটুল সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম দিনই ঠেলাগাড়ির সঙ্গে এ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ভেঙে ঘরে এল। বাবামা কেউ দুলাভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না।

রেবেকার মনে ক্ষীণ ভয় ছিল, দুলাভাই হয়তো বলে বসবেন, মেয়েমানুষ একা-একা এত দূর যাবে কি? আমেরিকা জায়গাটাও মেয়েদের জন্যে তেমন সুবিধে না। তাহলেই সর্বনাশ হত। ভাগ্যিস দুলাভাই কিছু বলেন নি। মানিঅর্ডার পাবার দু দিন পর তার উপদেশ-ভর্তি দীর্ঘ চিঠি এসে পড়ল। পুনশ্চতে লেখা–ইটের ভাটায় আগুন দেওয়া হবে বলে এখন আসতে পারছি না, তোমার রওনা হবার দিন সাতেক আগে আসব।

বাবা-মা তাতে রাজি হলেন না। টুটুলকে পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে আসবার জন্যে। টুটুল নিয়ে এল।

দুলাভাই ঘরে ঢুকে প্রথম যে-কথাটা বললেন, সেটা হচ্ছে–একটা ভালো ছেলে আছে আমার হাতে, ঠিকানা নিয়ে এসেছি। বাবা-মা যেন এই কথাটা শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। টুটুল বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, ছোটআপার বিয়ে, ছোটআপার বিয়ে।

দুলাভাই ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে ছেলের ছবি বের করলেন। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছবির উপর। টানাটানি করতে গিয়ে ছবির কোণা ছিঁড়ে গেল। স্টুডিওতে তোলা বোকা-বোকা ধরনের চেহারার একটা মানুষ। একুশ তারিখে যার আমেরিকা যাত্রা, তার বিয়ে হয়ে গেল তের তারিখে সেই বিয়েও অদ্ভুত। ছেলে তার মামা আর ছোটচাচাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে এসেছে। ছেলের বাবা আসতে পারেন নি, অসুস্থ।

মেয়ে দেখে তাদের পছন্দ হল। ছেলের মামা বললেন, এক জন মৌলবী ডেকে নিয়ে আসুন, বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যাক। আমি ছেলের বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি। মেয়ে যখন চলে যাচ্ছে, সময়ও তো নেই হাতে, কী বলেন?

বড়ো দুলাভাই সঙ্গে সঙ্গে কাজী খুঁজতে বের হয়ে গেলেন। রাত এগারটার সময় বিয়ে পড়ান হয়ে গেল।

পাশের ঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। রেবেকা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে দরজা খুলে বের হল। যেমানুষটি কাল রাতে তাকে নিয়ে এসেছে সে এগিয়ে এসে বলল, ঘুম ভালো হয়েছে?

ভালো। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি?

না, বেশিক্ষণ না। ঘন্টা তিনেক। এখন মাত্র আটটা বাজে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, লম্বা ঘুম দিয়েছি।

বড়ো রকমের জানির পর এ-রকম হয়। ঘন্টাখানেক ঘুমালেই মনে হয় অনেকক্ষণ ঘুমান হল। কিছুক্ষণ পর আবার ঘুম পায়। খিদে হয়েছে? ব্রেকফাস্ট তৈরি করি?

এই লোকটিকে এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে। এ যেন অন্য লোক। রাতে তালগাছের মতো লম্বা লাগছিল। এখন লাগছে না। যতটা বয়স্ক মনে হচ্ছিল, ততটা বয়স্ক মনে হচ্ছে না। ছোটমামার চেহারার সঙ্গেও এর কোন মিল নেই।

ব্রেকফাস্ট খুব সুবিধের হবে না। ঘরে কিছু ছিল না। আমি নিজে ভোরবেলায় কিছু খাই না, তাই কিছু রাখা হয় না। আসুন, টেবিলে আসুন।

রেবেকা অবাক হয়ে তাকাল। এই লোকটি এখন তাকে আপনি-আপনি করে বলছে কেন?

রেবেকা, আমি আপনার ডরমিটরিতে ফোন করেছিলাম। আপনার সব ব্যবস্থা করা আছে ওখানে। নাশতা খাবার পর আপনাকে দিয়ে আসব। আপনি চা খাবেন, না কফি? এখানে ভালো চা পাওয়া যায় না। কফি খুব ভালো। ব্রাজিলের কফিনিস থেকে তৈরী।

আমি চা খাব।

রেবেকা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, কাল রাতে আপনি আমাকে তুমিতুমি করে বলছিলেন। এখন আপনি-আপনি করছেন কেন?

রাতে তুমি-তুমি করে বলছিলাম বুঝি? কেন, আপনার মনে নেই?

না। মনে নেই।

এ বাড়িতে আপনি একাই থাকেন?

হ্যাঁ, একা থাকি। কিছু দিন আমার এক বন্ধু ছিল–ফরিদ। এখন একা।

রেবেকা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই লোকটিকে এত চেনা-চেনা লাগছে কেন? খুব পরিচিত কারো চেহারার সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু কার চেহারা?

আমি এয়ারলাইনস-এ টেলিফোন করেছিলাম, ওরা আপনার সুটকেস ট্রেস করেছে। দশটায় যেতে বলেছে। সেখান থেকে আমরা সুটকেস নেব, তারপর আপনাকে রেখে আসব ডরমিটরিতে।

কোথায়?

যেখানে ওরা আপনার জায়গা করেছে। রুম নাম্বার সিক্স। আমি ওদের টেলিফোন করেছিলাম।

ও।

আপনি দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দিন যে ঠিকমত পৌঁছেছেন। ওরা সবাই নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছে। বাসায় টেলিফোন থাকলে টেলিফোন করা যেতে পারে।

টেলিফোন নেই।

পাশের কোনো বাসায় আছে, যারা ডেকে দেবে?

জজ সাহেবের বাসায় আছে, কিন্তু ওদের নাম্বার জানি না।

তাহলে টেলিগ্রামই করা যাক। ঠিকানা বলুন।

রেবেকা ঠিকানা বলল।

বলুন কী লিখব?

রিচড সেফলি।

পাশা হাসিমুখে বলল, আপনার এই টেলিগ্রাম আপনার সব আত্মীয়স্বজন পড়বে। কাজেই আরো দুটি লাইন যোগ করে দিই? ওদের ভালো লাগবে।

রেবেকা কিছুই বলল না। পাশা বলল, আমি লিখলাম–নিরাপদে পৌঁছেছি। তোমাদের সবার জন্য খুব মন খারাপ লাগছে। এত সুন্দর দেশ, কিন্তু মোটও ভালো লাগছে না।

রেবেকা তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তার চোখ ভিজে উঠছে। পাশা বলল, পাঠাব এ টেলিগ্রাম?

হ্যাঁ, পাঠান।

আপনার এই মন-খারাপ ভাব দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। যখন পড়াশোনা শুরু হবে, তখন দেখবেন দম ফেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। এবং দেখতে দেখতে দেশে ফেরার দিন এসে যাবে। কী আনন্দ হবে, চিন্তা করে দেখুন।

রেবেকা লক্ষ করল, তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। পাশা নরম গলায় বলল, বিদেশ থেকে দেশে ফেরার আনন্দ ভোগ করবার জন্যেই সবার কিছু দিন বিদেশে থাকা উচিত। ফেরার সময় সবাই একটা নেশার ঘরে থাকে। যাই দেখে তাই কিনে ফেলতে চায়। আমি আমার এক বন্ধুকে দেখেছি, সে তাদের বাড়ির কাজের ছেলেটির জন্যে পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে একটা ডিজিট্যাল ঘড়ি কিনল। অথচ সেই ছেলেটিকে সে কোনো দিন দেখেও নি। চিঠিপত্রে এক-আধ বার তার নাম এসেছে।

রেবেকার চোখ পানিতে ভরে উঠেছে। সে উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে গিয়ে সে খানিকক্ষণ কাঁদবে।

পাশা মেয়েটির প্রসঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপার লক্ষ করল–এই মেয়ে এক বারও আপনাকে ধন্যবাদ, এই কথাটি বলে নি। এক জন মানুষ রাতদুপুরে তাকে নিয়ে এসেছে, সব রকম ঝামেলা মেটাবার চেষ্টা করছে–এই দিকটি যেন তার চোখেও পড়ছে না। যেন সমস্ত ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, এরকমই হওয়া উচিত। এর কারণ কী?

একটিমাত্র কারণ–হয়ত এই মেয়ে নিজের পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে তেমন মেশে নি। পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে যে-ব্যবহার সে পেয়ে এসেছে তাতেই সে অভ্যস্ত। বাইরের একটি মানুষ এরকমই ব্যবহার করবে বলে তার ধারণা। তাছাড়া দেশের বাইরে

নিজের দেশের মানুষদের সব সময়ই খুব আপন মনে হয়। ওদের কাছ থেকে আত্মীয়দের মতো ব্যবহার চোখে পড়ে না। সেটাই তো স্বাভাবিক।

৫. ফুড টেকনলজির শর্ট কোর্স

সোমবার ভোর নটায় ডক্টর ওয়ারডিংটন, ফুড টেকনলজির শর্ট কোর্স উদ্বোধন করলেন। সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র। অর্ধেকের বেশি হচ্ছে বিদেশী। মেয়েদের সংখ্যা সাত। তাদের মধ্যে তিন জন বিদেশী। রেবেকা, শ্রীলঙ্কার আরিয়ে রত্ন এবং রেড চায়নার মি ইন। মি ইন খুব সিরিয়াস। ড. ওয়ারডিংটনের উদ্বোধনী বক্তৃতাও সে নোট করতে লাগল।

ড. ওয়ারডিংটন প্রথমে কী-একটা রসিকতা করলেন। রেবেকা সেই রসিকতাটি বুঝতে পারল না। কিন্তু আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা খুব মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল। রেবেকার প্রথমে মনে হল, একমাত্র সেই বুঝতে পারে নি। তারপর লক্ষ করল বিদেশীদের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তার পাশে বসে আছে। শ্রীলঙ্কার আরিয়ে রত্ন। সে বিরক্ত মুখে বলল, কী বলছে? রেবেকা মাথা নাড়ল, সে জানে না।

কোর্স কোঅর্ডিনেটরের মূল বক্তৃতা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হল না। তিনি সম্ভবত বিদেশীদের জন্যেই প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণের চেষ্টা করছিলেন এবং পারছিলেন। কোর্সটি ছোট। কিন্তু ছোট হলেও এটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, কোর্স শেষ হবার পর সবাই ফুড টেকনলজির বেসিক্সগুলি খুব ভালোমত জানবে। প্রথম পাঁচ সপ্তাহ আমরা তিনটি কোর্স দেব। কেমিস্ত্রি, রেডিয়েশন কেমিষ্ট্রি এবং মাইক্রোবায়োলজি। পরের তিন সপ্তাহ প্র্যাকটিকেল ট্রেনিং হবে মেনিয়াপোলিসে ফুড প্রসেসিং-এর কারখানায়। বাকি থাকল চার সপ্তাহ। সেই চার সপ্তাহে সবাইকে একটি করে স্পেশাল টপিকে পেপার করা হবে। টপিকগুলি এখনি দিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা তোমাদের পছন্দমত টপিক নিতে পার।

এই পর্যায়ে ড. ওয়ারডিংটন আরেকটি রসিকতা করলেন। আমেরিকানগুলি গলা ছেড়ে হাসতে লাগল। আরিয়ে রা বিরক্ত মুখে ফিসফিস করে বলল, ব্যাটা বলছে কী? মি ইনও অস্বস্তির সঙ্গে তাকাচ্ছে। শুধু জর্ডনের আবদুল্লাহ পেটে হাত দিয়ে ঠা-ঠা করে আসছে। বিদেশী ছেলেদের মধ্যে এই এক জনের নামই সে মনে রেখেছে। সে অবশ্যি নিজের নাম আবদুল্লাহ বলে নি, বলেছে–আবাডুল্লা।

ড. ওয়ারডিংটন বললেন, এখন আমরা স্পেশাল টপিকগুলি ভাগ করে দেব। তারপর পঁচিশ মিনিটের কফি-ব্রেক আছে। কফি-ব্রেকের পরপরই থিওরি ক্লাস শুরু হবে। থিওরি ক্লাসে দু রকমের পরীক্ষা হবে। একটা হচ্ছে ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুইজ। অন্যটি কোর্স শেষ হবার পর। ফাইনাল গ্রেডিং হবে দুটি মিলিয়ে। ওয়েটেজ হচ্ছে ফিফটি-ফিফটি।

আরিয়ে রত্না চোখ কপালে তুলে বলল, পরীক্ষা হবে নাকি? কী সর্বনাশ! আমি তো পরীক্ষার জন্য তৈরী না।

রেবেকা বলল, এখন হবে না। পড়াবার পর হবে।

এই বয়সে পরীক্ষা দেব কী? তাছাড়া কেমিষ্ট্রি আমার কিছুই মনে নেই।

ড. ওয়ারডিংটন বললেন, কারো কিছু বলার আছে? কোনো প্রশ্ন? কোন সাজেশান?

এক জন আমেরিকান বলল, আমাদের কি সাইড সিইং-এ কোনো প্রোগ্রাম আছে?

না, নেই। এই অঞ্চলে দেখার কিছু নেই। তবে তোমরা যদি কনট্রিবিউট করতে চাও, তাহলে সাউথ ডাকোটায় একটা টিপের ব্যবস্থা করা যাবে। যারা উৎসাহী তারা হাত তোল।

আমেরিকানরা সবাই হাত তুলল। আর তুলল আবদুল্লাহ্। সে দুহাত তুলে বসে আছে।

কফি-ব্রেক দেওয়া গেল। রুম নাম্বার ইলেভেন-পেট্রিসিয়া হলে কফি দেওয়া হয়েছে। গুড ডে।

রেবেকা উঠতে যাচ্ছিল। ওয়ারডিংটন তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি আমেরিকা পৌঁছানর আগেই তোমার নামে দেশ থেকে চিঠি এসেছে। এই নাও। আশা করি এটা তোমার জন্যে একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। এই নাও।

রেবেকা হতভম্ভ হয়ে চিঠি নিল।

ওয়ারডিংটন বললেন, প্রেমিকের চিঠি নিশ্চয়ই। শুধুমাত্র প্রেমিকরাই এত ভারি চিঠি লেখার সময় পায়।

রেবেকা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, আমার স্বামীর চিঠি, স্যার।

তাহলে নিশ্চয়ই নিউলি ম্যারেড?

জি-স্যার।

তোমার স্বামী এক জন বুদ্ধিমান লোক। তুমি দেশ থেকে রওনা হবার আগেই সে নিশ্চয়ই চিঠি লিখেছে, তাই না?

রেবেকা কিছু বলল না।

চল, কফি খেতে যাই। কফি খেতেখেতে তুমি তোমার স্বামীর চিঠির উত্তেজক অংশগুলি আমাকে পড়ে শোনাবে। হা-হা-হা।

বাবার বয়েসী এক জন ভদ্রলোকের বার্তার কি অদ্ভুত ধরন! যেন সে তার বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে।

ওয়ারডিংটন হঠাৎ কৌতূহলী স্বরে বললেন, তোমার হাতের তালুতে লাল রঙের নকশা দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কী?

বিয়ের সময় আমাদের দেশের মেয়েরা হাতে এরকম নকশা করে।

এই নকশা কি সারা জীবন থাকে? পার্মানেন্ট?

না, কিছু দিন থাকে। তবে বলা হয়, সুখী স্বামী-স্ত্রীদের বেলায় এই রঙ দীর্ঘদিন থাকে।

ভেরি ইন্টারেস্টিং। আগামী সপ্তাহে আমার স্ত্রী আসবে মিনেসোটা থেকে। তাকে তোমার হাত দুটি দেখাতে চাই। তত দিন পর্যন্ত নকশাগুলি থাকবে আশা করি। থাকবে না?

জ্বি-স্যার, থাকবে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তার মানে কি এই, তোমরা খুব সুখী স্বামী-স্ত্রী?

রেবেকা লজ্জা পেয়ে গেল। সে ভেবেছিল বুড়ো ওয়ারডিংটন সত্যি সত্যি তার পাশে বসবেন এবং চিঠি পড়তে চাইবেন। সেরকম কিছু হল না। তিনি একটি সোনালি চুলের আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে রসিকতা করতে লাগলেন।

মেয়েটি হাসছে। তিনিও হাসছেন। সোনালি চুল কী বলে যেন খোঁচা দিল ওয়ারডিংটনের পেটে। দুজনেই হাসছে। এই আনন্দের সবটুকুই কি সত্যি? ভান নেই এর মধ্যে?

রেবেকা ভেবেছিল, কফি খেতেখেতে সে চিঠি খুলবে না। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পড়বে। তারপর ঠিক করল শুধু খামটা খুলবে, চিঠি পড়বে না। সে-প্রতিজ্ঞাও রইল না। সে ঠিক করল, প্রথম চারটি লাইন পড়বে। গুনে গুনে চার লাইন। এর বেশি নয়।

কিন্তু সে গোটা চিঠিই পড়ে ফেলল–রেবা খুব অবাক হয়েছ, তাই না? অবাক করবার জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। তোমাকে জানতে না দিয়ে আমেরিকার ঠিকানা যোগাড় করাটাই ছিল সবচে বড়ো কষ্ট। তারপর চিঠি লেখা। প্রথম চিঠি। কোনো বানান ভুল যেন না হয়। বাসায় নেই ডিকশনারি। এক শ ত্রিশ টাকা খরচ করে কিনলাম ডিকশনারি। এটা কিনেও এক বিপদ। যে-বানানই লিখি, মনে হয় ভুল। ডিকশনারি খুঁজতে গিয়ে সেই শব্দ পাই না। তারপর আছে ভাষার ব্যাপার। আমি চিঠি খুব বেশি লিখি না। কায়দা-কানুন ভালো জানা নেই। তুমি নিশ্চয়ই খুব হাসবে। তবে হাস আর যাই কর, এই চিঠি তোমাকে প্রচুর আনন্দ

দেবে। এই নিয়ে আমি বাজি রাখতে পারি। প্রবাসী জীবনে চিঠির মূল্য অনেক বেশি। সেই চিঠি যদি প্রিয়জনের লেখা হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

মাত্র এক দিনের পরিচয়ে নিজেকে তোমার প্রিয়জন ভাবছি। তুমি আবার হাসছ না তো? কীরকম হুট করে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের, তাই না? তোমার দুলাভাই ঠিক করলেন– তোমাদের বাসাতেই বাসর হবে। তাড়াহুড়া করে একটা ঘরে বিছানা করা হল। ফুল না পাওয়ার জন্যই হয়তো তোমার ছোট বোন পুরো এক সেন্টের শিশি উপুড় করে দিল বিছানায়। কড়া গন্ধে মাথা ধরে যাবার উপক্রম। আমি বসে আছি তোমার জন্য। তোমার আসার নাম নেই। সম্ভবত আসতে রাজি ছিলে না। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে হয়েছে। কাদতে-কাদতে চোখমুখ ফুলিয়ে তুমি এলে। এসেই উল্টোদিকে মুখ করে শুয়ে পড়লে। বন্ধুবান্ধবের কাছে বাসর রাতের কত গল্প শুনেছি। বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী আবেগে অভিভূত হয়ে কত ছেলেমানুষি কাণ্ড করে। আমাদের বেলায় সে-সব কিছুই হচ্ছে না। আমার একসময় ধারণা হল তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। আমি পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম, রেবেকা, তোমার কাছে সেফটিপিন আছে? মশারিটা এক জায়গায় ছেড়া, মশা ঢুকছে। তুমি দারুণ লজ্জা পেয়ে উঠে বসলে। ছেড়া মশারির জন্যে অপমানিত বোধ করলে বোধহয়। সেফটিপিন দিয়ে ছেড়া মেরামত করা হল। তখন আমি আরেকটি ছেড়া বের করলাম। তুমি চোখ-মুখ লাল করে সেটিও বন্ধ করলে। এবং বললে, আপনি এরকম করে আসছেন কেন?

হাসলে কেউ রাগ করে?

ছোঁড়া মশারির কারণে তোমার সঙ্গে কিছুটা কথাবার্তা হল। তারপর আমি বললাম, রেবেকা, আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হয়। তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?

তুমি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলে। কারণ পরিষ্কার হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বিদেশযাত্রা উপলক্ষে তোমাদের আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়েছে। মেঝেতে ঢালাও বিছানা। যে যেখানে পেরেছে ঘুমিয়ে আছে। বাথরুমে যেতে হলে ওদের ডিঙিয়ে যেতে হবে। তুমি ক্ষীণ স্বরে বললে, এদের উপর দিয়ে চলে আসুন। কিছু হবে না।

রেবেকা, বাকি রাতটা আমরা গল্প করেই কাটালাম। শুধু গল্প অবশ্যি না, ওর সঙ্গে অন্য ব্যাপার আছে। ঐ প্রসঙ্গটি এখন তুলে আর তোমাকে রাগাতে চাই না। ঐ রাতে যা রেগেছিলে।

রেবেকা, যখন এই চিঠি লিখছি তখন তুমি পাশেই আছ। কিন্তু যখন এই চিঠি পাবে তখন পাশে থাকবে না। বিরহ দিয়ে শুরু হল জীবন। কাজেই আশা করছি, মিলনে তার শেষ হবে। অসংখ্য চুমু তোমার ঠোঁটে গালে এবং......। কি, আবার রাগিয়ে দিলাম?

রেবেকা চোখমুখ লাল করে ক্লাস করতে গেল। একটুও মন দিতে পারল না। লেকচারে। তবু জীবনের প্রথম কুইজ পরীক্ষায় এক শতে এক শ পেয়ে নিজে অবাক হল এবং অন্য সবাইকে অবাক করে দিল। আবদুল্লাহ্ সবচেয়ে কম নাম্বার–নয় পেয়ে খুব হাসতে লাগল, যেন বিরাট একটা বাহাদুরি করেছে।

৬. আবহাওয়াবিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী

ফার্গো ফোরামে এক জন আবহাওয়াবিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী ছাপা হয়েছে। তিনি হিসেবটিসেব করে বের করেছেন, আরেকটি বরফ-যুগ আসছে। এই বরফযুগের স্থায়িত্ব হবে তিন শ বছর। সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢেকে যাবে। সবচেয়ে উষ্ণতম স্থানের তাপমাত্রা হবে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে।

খবর ছাপা হয়েছে বক্স করে। বিজ্ঞানীর ছবি আছে। হাসি-হাসি মুখের ছবি। বরফ-যুগ আগমনের সংবাদে তাকে মোটেই বিচলিত মনে হচ্ছে না।

পাশা বিরক্ত ভঙ্গিতে বিজ্ঞানীর ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল। বিজ্ঞানীরাও আজকাল সেনসেশন তৈরি করতে চান। সবাই চায়, তারাইবা বাদ যাবে কেন?

খবরের কাগজে পড়বার মতো আর কিছু নেই। ইথিওপিয়ার কয়েকটি বীভৎস ছবি দিয়ে একটি দীর্ঘ ফিচার আছে। সেটি পড়তে ইচ্ছা করছে না। কোথায় কে না। খেয়ে আছে, তা আজকের এই ছুটির সকালে জানতে ইচ্ছা করে না।

প্রথম প্রথম এই পেট-বের-হয়ে-যাওয়া অপুষ্ট শিশুগুলোর ছবি দেখলেই গা কেমন করত। এখন করে না। পত্রিকাওয়ালারা ছবি ছাপিয়ে-ছাপিয়ে মানুষের মমতা নষ্ট করে দিয়েছে।

পাশা অন্যমনস্কভাবে কয়েকটি ছবি দেখল। প্রতিটির নিচে খুব কাব্যিক ক্যাপশন। মায়ের শুকনো দুধ দুহাতে খামচি দিয়ে ধরে আছে একটি শিশু। শিশুটিকে দেখাচ্ছে একটা বড়

মাপের পোকার মত। মায়ের মুখ মিসরের মমির মতোই ভয়াবহ। নিচে লেখা-মেডোনা। কোনো মানে হয়?

ছবিটির দিকে তাকালেই মনে হয় সাংবাদিক ভদ্রলোক একটি পুরস্কার আশা করছেন। পুলিটজার পুরস্কার, লা গ্রান্দি পুরস্কার, দি র্যাবো অনার। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের একটি মোম ছবি মানেই অর্থ, সাফল্য এবং পরিচিতি পাশা প্রবন্ধটি পড়ে ফেলল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই, বাংলাদেশের নাম এই প্রবন্ধে আছে। প্রবন্ধকার শেষের দিকে দুঃখ করে লিখেছেন ইথিওপিয়া, বাংলাদেশ–এই সব অঞ্চলে কোনো দিন কি আশা ও আনন্দের সূর্য সত্যি সত্যি উঠবে?

পাশার বিরক্তির সীমা রইল না। ইথিওপিয়ার কথা লিখছ ভালো কথা, আবার বাংলাদেশকে টেনে আনা কেন? মাথায় একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে। বিরক্তির কারণেই হচ্ছে। মাঝে মাঝে এই যন্ত্রণা দ্রুত ছড়িয়ে যায়। দুটি এক্সট্রা স্ট্রেংথ টাইলানলও ঠিক কাজ করে না। অনেক দিন ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় না, এক বার যাওয়া দরকার। পঁয়ত্রিশের পর শরীরের ছোটখাটো অসুবিধাগুলোর দিকেও নজর রাখতে হয়।

পয়ত্রিশের পর মানুষ তার নিজের শরীরকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করতে শুরু করে। হার্ট কি ঠিকমতো বিট করছে? ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না তো? লিভার, সে ঠিকঠাক আছে? চোখের মণির উপর ক্যালসিয়াম দানা বাধতে শুরু করে নি তো? রোদের দিকে তাকালে রামধনু ভাসে না তো?

শোবার ঘরে টেলিফোন বাজছে। উঠে গিয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে না। আবার চুপচাপ বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। এটাকেই কি ডিপ্রেশন বলে? পাশা উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে

রিংবন্ধ হয়ে গেছে। সে চলে গেল শোবার ঘরে। আবার টেলিফোন আসবে। এমন লোকের সংখ্যা খুব কম, যারা প্রথম বারে না পেলে দ্বিতীয় বার রিং করে না।

আবার রিং হল। আমেরিকান মেয়ের গলা। যান্ত্রিক ভাব আছে গলার স্বরে। তার মানে সে এক জন সেক্রেটারি। প্রতিদিন তিন-চার ঘণ্টা করে তাকে টেলিফোনে কথা বলতে হয়।

পাশা চৌধুরী?

হ্যাঁ।

এই টেলিফোন কি আপনার?

মেয়েটি যন্ত্রের মতো পাশার টেলিফোন নাম্বার আওড়াল।

হ্যাঁ, আমার, কী ব্যাপার?

আমি বেল টেলিফোন থেকে বলছি। সুশান আমার নাম!

হ্যালো সুশান।

তুমি কি বেল টেলিফোন থেকে কোনো চিঠি পাও নি?

পেয়েছি।

চার মাসের টেলিফোন বিল বাকি পড়ে আছে। আমরা আর তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করব।

আমি তিন সপ্তাহের আগেই বিল দেবার ব্যবস্থা করব।

ভালো কথা, তুমি এখন থেকে এই টেলিফোনে ওভারসীজ টেলিফোন করতে পারবে না। এই অসুবিধার জন্যে আমরা দুঃখিত।

গুড ডে সুশান।

গুড ডে।

সব অফিস-সেক্রেটারির নাম সুশান হয় কেন, তাই ভাবতে-ভাবতে পাশা বসার ঘরে এল। পত্রিকায় পড়ার আর কিছু নেই। সময় কাটানর মতো ব্যবস্থা করা যায় কি? ছবি দেখলে কেমন হয়? অনেক দিন ছবি দেখা হয় না।

ফার্গো ফোরামে দুটি কলাম জুড়ে আছে ছবির খবর। কোন নামই পরিচিত মনে হচ্ছে না। একটি নাম খানিকটা পছন্দ হচ্ছে–দি ডার্ক। ভূতের কাণ্ডকারখানা হবে। ছবি সম্পর্কে কোনোতথ্য নেই। শুধু লেখা পিজি। প্যারেন্টাল গাইডেন্স। বাবামারা যদি মনে করেন, তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ছবি দেখতে পারেন।

দুপুরবেলা ভূতের ছবি দেখে খানিকটা ভয় পাওয়া মন্দ কি? বিরক্তির ভাবটা তো কাটবে। ভয় পাওয়ার জন্যে কিছু বুড়োবুড়ি নিশ্চয়ই থাকবে হলে। সামান্য শব্দেই চেচিয়ে উঠে একটা কাণ্ড করবে।

অনেক দিন বুড়োবুড়িদের নিয়ে কোনো ছবি দেখা হয় না। একটা দেখা যেতে পারে।

আবার টেলিফোন বাজছে।

হ্যালো, পাশা চৌধুরী।

বলছি।

আমি বেল টেলিফোন থেকে বলছি–মাইকেল।

হ্যালো মাইকেল।

তুমি আমাদের কাছ থেকে কোনো নোটিশ পাও নি?

পাশা এক বার ভাবল বলে–তুমি যে-খবরটি দিতে চাচ্ছ, তা ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, আবার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে কিছু বলল না, কথা শুনে গেল।

দেড় হাজার ডলারের মতো ব্যাঙ্কে আছে। চার মাসের টেলিফোন বিল এই মুহূর্তে চেক লিখে দিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

গুড ডে মিঃ পাশা। কাজের মধ্যে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত। দি ডার্ক ছবিটি দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আজকাল কোনো পরিকল্পনাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

পাশা ঠিক করল, দুপুরবেলা খানিকটা ঘুমানর চেষ্টা করবে। খাঁটি বাঙালী একটি ব্যাপার। যেখানে সবাই কাজকর্ম করছে, সেখানে নরম বিছানায় আরামের ঘুম।

মেইল বক্সে বেশ কিছু চিঠি-শুয়ে-শুয়ে চিঠি পড়েও খানিকটা সময় কাটান যায়। আজ হচ্ছে ডিসেম্বরের চার তারিখ। ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এপল গেমস-এর পিআরও টেলিফোন করবে। সেরকমই কথা আছে। পিআরওর কথাবার্তায় বোঝা গেছে এপল গেমস প্রাথমিকভাবে তার খেলাটি পছন্দ করেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের মিটিংটি হবে ডিসেম্বরের দু তারিখে। পাশা বলেছিল, আমি টাকাপয়সার একটা বড় রকমের ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

অবস্থা বদলাবার একটা বড়ো সম্ভাবনা আছে মিঃ পাশা। গেমস ডিভিশনের অনেকের ধারণা, এই খেলাটি বড় রকমের হিট হবে। তবে আমাদের হাতে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং গেমস-এর সফটঅয়্যার জমা পড়েছে।

সেগুলি কীরকম বলতে পারেন?

না, পারি না।

ভিডিও গেম-এর এই খেলাটি তৈরি করতে পাশার লেগেছে ছ মাস। প্রোগ্রাম লেখা, বদলান, পরীক্ষা করে দেখা। জিনিসটি দাড়িয়ে যাবে আশা ছিল না। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। খেলাটি এরকম:

ভিডিও ক্যাসেট কম্পুটারে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি মানুষের ছবি ভেসে উঠবে। নিচে লেখা হবে–এই মানুষটির নাম জন। তার সঙ্গে আছে পাঁচ শ ডলার। এই পাঁচ শ ডলার নিয়ে তাকে এক মাস টিকে থাকতে হবে। সে কি পারবে?

তারপর তিনটি লটারির টিকিট ভেসে উঠবে পর্দায়। সে ইচ্ছা করলে একটি টিকিট কিনতে পারে পাঁচ ডলার দিয়ে। জিতে গেলে সে পঞ্চাশ ডলার পাবে। কোন টিকিটটি কিনবে তা নির্ভর করবে যে খেলাটি খেলছে তার ওপর। সে জানে না তিনটির ভেতর কোনটি সেই বিশেষ টিকিট।

তেমনিভাবে আসবে শেয়ার মার্কেট। সে কি শেয়ার কিনবে, না কিনবে না?

লোকটি কি এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করবে, না করবে-না? এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া না করে সে রেলওয়ে স্টেশনেও রাত কাটাতে পারে। কিন্তু সেখানে গুণ্ডাদের হাতে টাকাপয়সা খোয়ানর ভয় আছে।

খেলাটি যথেষ্টই উত্তেজনার। লোকটিকে জিতিয়ে দিতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে খেলতে হবে। প্রচুর ভেরিয়েশন। খেলাটি এপল গেমস-এর পছন্দ নাহওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সময় খারাপ, হয়তো শেষ মুহূর্তে পিআরও ঠাণ্ডা গলায় বলবে, মিঃ পাশা, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনার এত চমৎকার একটি খেলা আমরা নিতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত এই বিশেষ খেলাটি খেলতে হবে পাশাকে। দেড় হাজার ডলারের খেলা। খেলতে হবে সাবধানে। পাশা চিঠির গাদা নিয়ে বসল। দেশের চিঠি এসেছে। তিনটি। এ সব পড়বার কোন অর্থই হয় না। চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় চিঠির বক্তব্য।

জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। জীবনধারণ করা কঠিন। ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল বক্তব্য একটিই। আমাদের বেঁচে থাকার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। তোমার উপর আমার দাবি আছে। ভালবাসার দাবি, আত্মীয়তার দাবি। আমাদের দুঃসময়ে তুমি আমাদের দেখবে না?

দেশের চিঠি আগে পড়ার দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছাড়া গেল না। অপরিচিত হাতের লেখার একটি চিঠি খুলল সে। দামী একটা কাগজে গোটা-গোটা করে লেখা। পাশার ফুফাতো বোনের স্বামী। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে, আমেরিকা আসবার একটা ব্যবস্থা পাশা ভাইকে করতেই হবে, যেভাবেই হোক। দরকার হলে আমেরিকায় সে কুলিগিরি করবে ইত্যাদি। এই ছেলেটিকে সে চেনে না। ফুফাতো বোনের কথাও ভালো মনে নেই। নাক-বোচা একটা ছোট্ট মেয়ে দেখে এসেছিল। রাত-দিন রান্না-বাটি খেলত। একা-একা সে হাত নাড়ছে, ছাক-ছাঁক শব্দে ডাল বাগার দিচ্ছে–বিচিত্র খেলা। এই মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে। বাবা-মার আপত্তি উপেক্ষা করে একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করেছে, ভাবাই যায় না। প্রথম প্রেমের স্বপ্নভঙ্গ ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। পাশা মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, ছেলেটির চিঠির জবাব দেবে না। তবে ফুফাতো বোনকে এক শ ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দেবে। সঙ্গে একটি চিঠি থাকবে যাতে লিখবে–তুমি যে বিয়ে করে ফেলেছ, তা জানতাম না। তোমার ডাল রান্নার ছাঁক-ছাঁক শব্দ এখনো কানে বাজে। এক শ ডলার পাঠালাম। পছন্দসই কোন কিছু কিনে নিও। আর ভালো কথা, তোমার বর আমেরিকা আসতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই। এখন এ-দেশে আসবার পদ্ধতি আমার জানা নেই। তাকে দেশেই একটা কিছু করতে বল।

দ্বিতীয় চিঠিটি আমিনুল হকের, ইনি জনতা ব্যাঙ্কের কচুক্ষেত শাখার এক জন কর্মচারী। পাশার আত্মীয়। আত্মীয়তার সূত্রটি ভদ্রলোক বিশদভাবে লিখেছেন, তবুও তা পরিস্কার নয়। এই ভদ্রলোক তার ছেলেকে আমেরিকায় ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে চান। তিনি শুনেছেন, এ-দেশে প্রচুর বাঙালী ছাত্র কাজকর্ম করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা যদি পারে, তার ছেলে কেন পারবে না? তিনি কষ্টটষ্ট করে যেভাবেই হোক ছেলের ভাড়ার টাকা যোগাড় করবেন। ছেলে ভালো, ম্যাট্রিকে তিনটি লেটার নিয়ে ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছে, তবে জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বেশি ভালো হয় নি। হায়ার সেকেণ্ড ডিভিশন আছে, ইত্যাদি।

তৃতীয় এবং শেষ চিঠিটি বড়োভাইয়ের। তিনি প্রতি মাসে টাকা পাওয়ার পর একটি চিঠি লেখেন, এবং সেখানে টাকাপয়সা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার থাকে না। তাঁর চিঠি অনেকটা অফিসিয়াল চিঠির মতো।

তোমার ড্রাফট পেয়েছি। ডলারের বাজার এখন একটু ভালো। প্রতি ডলারে সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে পেলাম। গতবার দর ছিল ছাৰিশ টাকা। তবে শোনা যাচ্ছে, দর এরকম থাকবে না। আমার এক জন পরিচিত এজেন্ট ২৭৮

আছে–কুন্দুস সাহেব। চাঁদপুরে বাড়ি। তিনি আমাকে সব সময় ভিতরের খবর দেন। তিনি বললেন, বাজারে বর্তমানে জার্মান মার্কের অবস্থা ভালো। ডলার এবং পাউণ্ড দুইটির দামই ভবিষ্যতে কমবে। বাসার আর সব খবর ভালো। তোমার খবর জানাবে। গত মাসে কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে চিন্তিত আছি। রোজার মাসে কিছু বেশি পাঠাতে পার কিনা দেখবে। তোমার ভাবীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

বড়ো ভাইয়ের প্রতিটি চিঠির শেষ লাইন তোমার আবীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পনের বছর ধরে এক জন মহিলার শরীর ভালো যায় না কীভাবে সে এক রহস্য।

এবার বড়ো ভাই কী লিখবেন কে জানে? এবারই তাঁকে কোনো টাকা পাঠান হয় নি। মা-র মৃত্যুর পর তিনি একটু ভয় পেয়েছিলেন। তার ধারণা হয়েছিল, হয়ত আমেরিকা থেকে ডলার আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই এক বারই তিনি তিন পাতার এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। সেখানে মার পেছনে শেষের দিকে কীভাবে জলের মত টাকা খরচ হয়েছে, তার বর্ণনা আছে। তিনি যে শেষ পর্যন্ত ছ হাজার টাকা কর্জ করলেন, সেই কথাও আছে। ইউনিভার্সিটিতে মেয়ে ভর্তি হয়েছে, তার রিকশা ভাড়াই মাসে যে দু শ টাকা–সেই কথাও আছে।

পাশা যথারীতি ড্রাফট পাঠিয়ে বড়ো ভাইয়ের আশঙ্কা দূর করে। বাকি চিঠিগুলো পড়তে ইচ্ছে করছে না। জরুরী কোনো কিছুই নয়।

আমেরিকায় তাকে জরুরী চিঠি লেখার কেউ নেই। খিদে লাগছে। ঘরে খাবার আয়োজন তেমন কিছু নেই। পনির এবং রুটি আছে। স্যাণ্ডউইচ বানান যায়। সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উঠতে হবে, পনির কাটতে হবে, রুটি গরম করতে হবে। পিৎসা হাটে একটা মিডিয়াম সাইজের পিৎসার অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। কেন জানি সেই কষ্টটাও করতে ইচ্ছা করছে না।

ঘরের হিটিং কি কাজ করছে না। কেমন যেন ঠাণ্ডাঠাণ্ডা লাগছে। নাকি সত্যি সত্যি বরফ-যুগ এসে যাচ্ছে। পাশা চাদর টেনে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলায়। কে যেন কলিং বেল টিপছে।

পাশা দরজা খুলে দেখল, রেবেকা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ শুকনো। শীতে সে কাঁপছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে কি?

৭. রেবেকা কাঁপা গলায় বলল

রেবেকা কাঁপা গলায় বলল, আমি ভেবেছিলাম বাসায় কেউ নেই। যা ভয় পেয়েছিলাম! একা-একা কীভাবে ফিরব, তাই ভাবছিলাম।

মার্থা নামিয়ে গেছে। ওকে ঠিকানা বলতেই সে চিনল। মার্থা আমার রুমমেট। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? ভেতরে আসতে বলুন।

ভেতরে এস রেবেকা।

রেবেকা হাসিমুখে ভেতরে ঢুকল। ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বের করল। হাত নীল হয়ে আছে। কোনো গ্লাভস নেই হাতে।

আপনি এত অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

শীতের দেশে এরকম হুট করে আসা ঠিক না। আমি নাও থাকতে পারতাম। তখন ফিরে যেতে কীভাবে? মার্থা মেয়েটিরই-বা কী রকম কাণ্ডজ্ঞান। চলে যাবার আগে তার তো দেখা উচিত ছিল বাসায় কেউ আছে কিনা।

আপনি এত রাগছেন কেন?

রাগছি না। টেলিফোন নাম্বার তো ছিল। ছিল না?

আমি কেন শুধু-শুধু টেলিফোন করব? পনের দিন ধরে এখানে আছি। আপনি কি আমাকে টেলিফোন করেছেন? এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এসে ভাবছেন খুব উপকার করা হয়েছে, তাই না?

পাশা লক্ষ করল মেয়েটি কথা বলছে রেগে-রেগে কিন্তু মুখ হাসি-হাসি।

আমি আসতাম না। এসেছি শুধু আপনাকে টাকাটা দেবার জন্যে। ঐদিন। জিনিসপত্র কিনতে মোট কত ডলার খরচ করেছেন?

এক শ সতের।

এই নিন এক শ কুড়ি। তিন ডলার আপনার বখশিস।

রেবেকা শব্দ করে হাসল। তার বেশ মজা লাগছে। কেন লাগছে, সে নিজেও পরিষ্কার জানে না। বাংলায় কথা বলতে পারছে, এটা একটা বড় কারণ। গত সপ্তাহের উইকণ্ডের বিকেলে ডরমিটরি ছেড়ে সবাই চলে গেল। শুধু আরিয়ে রত্না ছিল। সে ঘর বন্ধ করে তাঁর নিজের দেশের ক্যাসেট চালু করে দিয়েছে। কী ভয়ানক অবস্থা।

চা খাব। চায়ের পানি গরম করুন। আজ চা বানাব আমি।

পাশা চায়ের পানি বসাল। সে বেশ অবাক হয়েছে। ঐদিন রাতে যে-মেয়েকে নিয়ে আসা হয়েছে এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। এ অন্য মেয়ে। যে-কোনো কারণেই হোক সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। নতুন পরিবেশে নিজেকে কিছুটা মানিয়েও নিয়েছে।

রেবেকা বলল, আমি খুব বেশি কথা বলছি, তাই না? দেশে কিন্তু খুব কম কথা বলতাম। আপনি বোধহয় বিশ্বাস করছেন না।

করছি।

বাংলায় কথা বলতে পারছি এই আনন্দেই বকবক করতে ইচ্ছা হচ্ছে। গত পনের দিনে কারো সঙ্গে একটা বাংলা কথা বলি নি। এক বার শুধু ভুলে আরিয়ে রত্না কে বললাম–কেমন আছেন? সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আরিয়ে রত্না কে?

আরিয়ে রত্না হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মেয়ে। ভালো নাম হল–আরিয়ে রত্না চন্দ্রাণী।

কোটটা খুলে আরাম করে বস রেবেকা। ছটফট করছ কেন? রেবেকা কোট খুলতে-খুলতে বলল, আজ আপনি আমাকে তুমি-তুমি করে বলছেন। আপনি কি কিছুক্ষণ তুমি, তারপর আপনি, আবার কিছুক্ষণ তুমি–এইভাবে কথা বলেন?

পাশা কী বলবে ভেবে পেল না। পানি গরম হয়ে গিয়েছিল, সে নিজেই চা বানাল।

রেবেকা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনাকে আমি কী বলে ডাকি, বলুন তো? প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা, তখন মনে হয়েছিল ছোটমামার মত। মুখের নিচের দিকটা।

ছোটমামা ডাকতে পার।

কিন্তু এখন আপনাকে ছোটমামার মত লাগছে না। খুব এক জন চেনা লোকের মতো লাগছে। সেই চেনা লোকটি কে, ধরতে পারছি না।

পাশা নরম স্বরে বলল, বিদেশে এ রকম হয়। যে কোনো বাঙালী দেখলেই মনে হয় চেনা। পরিচিত কারো চেহারার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। আসলে অবশ্যি তেমন কোন মিল থাকে না।

কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে এক জন লোকের চেহারার সত্যি-সত্যি মিল আছে। আমি মনে করতে চেষ্টা করছি। মনে পড়লেই বলব। আপনি ছাড়া এখানে আর কোনো বাঙালী নেই?

করিম সাহেব ছিলেন। এখন নেই, সপরিবারে শিকাগো গিয়েছেন, স্প্রিং-এ ফিরবেন। স্প্রিং পর্যন্ত তুমি যদি থাক, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

রেবেকার শীত লাগছিল। ঘরটা বোধহয় সেরকম গরম নয়। সে গ্যাসের চুলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আগুনের ওপর হাত মেলে বলল, শুনুন, দশটার সময় আমার বান্ধবী আমাকে নিতে আসবে। ও গিয়েছে কোন এক পাবে। ফেরার পথে সে আমাকে নিয়ে যাবে। কাজেই দশটা পর্যন্ত আমি অনবরত বাংলায় কথা বলব। আপনি রাগ করতে পারবেন না। আর আমি আপনার এখানে ভাত খাব। গত এক সপ্তাহ ধরে ভেবে রেখেছি, আপনার এখানে ভাত খাব।

মুশকিলে ফেললে, ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা তো এখানে নেই।

সে কি! আপনি ভাত খান না?

ভাত খাব না কেন? ভাত খাই, তবে রান্নটান্নার অনেক ঝামেলা, কাজেই ঐ ঝামেলাতে যাই না।

বলেন কি আপনি!

রেবেকা সত্যিকার অর্থেই নিভে গেল।

আপনি ভাত খান না, এটা জানলে আমি সন্ধ্যেবেলায় আসতাম না।

তুমি ভাত খাবার জন্যেই এসেছ?

হ্যাঁ। আপনি রাগ করেন আর যাই করেন, আমি সত্যি কথাটা বলে ফেললাম।

পাশা উঠে দাঁড়াল। পাকা গায়ে দিতে-দিতে বলল, তুমি বস, আমি ব্যবস্থা। করছি।

কী ব্যবস্থা করবেন?

পাঁচ ব্লক দূরে একটা গ্রোসারি শপ আছে। চাল পাওয়া যায়। এক প্যাকেট চাল নিয়ে আসব। ভাত এবং মুরগির মাংস। তুমি রাঁধতে পার?

খুব পারি। আমিও তো আসছি আপনার সঙ্গে?

না, তুমি থাক। আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। হেঁটে যেতে হবে।

আপনার কি ধারণা, আমি হাঁটতে পারি না?

নিশ্চয়ই পার। কিন্তু বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা। তোমার অভ্যেস নেই। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমার খুব দেরি হবে না। একা-একা তোমার আবার ভয় লাগবে না তো?

আমার এত ভয়টয় নেই। ভয় থাকলে একা-একা এত দূর আসতাম?

মেয়েটি তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। ভারি সুন্দর লাগছে তো মেয়েটিকে! লিকুইড আইজ কি এই চোখকে বলে? ঐ রাতে মেয়েটিকে এত সুন্দর লাগে নি কেন? একটি মেয়ে কখনো রূপবতী, কখনো নয়-এরকম তো হতে পারে না। যে সুন্দর, সে সব সময়ই সুন্দর।

রেবেকা বলল, এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন?

পাশা লজ্জা পেয়ে গেল। বিব্রত স্বরে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও। আরেক কাপ চা বানিয়ে খাও। ফ্রীজে পনির আছে, পনির খেতে পার। আমার দেরি হবে না।

একা-একা রেবেকার খানিকটা ভয় লাগতে লাগল। এ বাড়ির হিটিং-এ কোনো গণ্ডগোল আছে। বেশ শব্দ করে গরম বাতাস আসতে থাকে। শব্দটা ভয় ধরিয়ে দেয়।

রেবেকা ফ্রীজ খুলল-খালি ফ্রীজ। এক টুকরো পনির পড়ে আছে। কাগজের প্যাকেটে দুধ। মাল্টার মত কয়েকটা ফল শুকিয়ে দড়ি-দড়ি হয়ে আছে।

সে চায়ের পানি চাপাল। চা খেতে ইচ্ছা করছে না। চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। ঘরে অনেক বই দেখা যাচ্ছে, একটিও বাংলা বই নয়। ভদ্রলোক সম্ভবত অনেক দিন ধরে এদেশে আছেন। জিজ্ঞেস করা হয় নি। এটা বেশ আশ্চর্য যে, রেবেকা তার সম্পর্কে কিছু জানতে চায় নি। ভদ্রলোকও কিছু জানতে চান নি। দু জন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলছে।

বড়োখালু বলে দিয়েছিলেন–এক বার গিয়ে পৌঁছাতে পারলে গাদাগাদা বাঙালী পাবি। দেখবি এরা কত হেল্পফুল। বিদেশে বাঙালীতে-বাঙালীতে খাতির অন্য জিনিস। এক জনের জন্য অন্য জন জান দিয়ে দেবে।

পানি ফুটতে শুরু করেছে, রেবেকা এগিয়ে গেল। আর ঠিক তখন বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল এই লোকটির চেহারা সুরাইয়ার বড়োচাচা বদিউজ্জামান সাহেবের মত। সুরাইয়া তাঁকে ডাকত বদি চাচা।

ক্লাস ফোরে সুরাইয়া তাদের সঙ্গে ভর্তি হয়। এবং প্রথম দিনেই খাতির হয়ে যায় রেবেকার সঙ্গে। যা কথা বলতে পারে মেয়েটা, গুজগুজ ফুসফুস করছে সবার সঙ্গে। এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। সেই কথাবার্তার বেশির ভাগই হচ্ছে বদি চাচাকে নিয়ে-যিনি জার্মানীতে থাকেন, যাঁর একটি জার্মান বউ আছে। অবিকল রাজকন্যার মত দেখতে। যার বড়ো ছেলের নাম পল, যে একটুও বাংলা জানে না। এক বার দেশে এসে তেলাপোকা উড়তে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বদি চাচার গল্পের কোনো শেষ নেই।

সেই বদি চাচা এক বার দেশে বেড়াতে এলেন। রেবেকা বন্ধুর বাড়িতে তাঁকে দেখতে গেল। ভদ্রলোক সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর বন্ধু? এরকম লজ্জা পাচ্ছে কেন? উকি দিচ্ছে কেন পর্দার আড়াল থেকে? এই মেয়ে, ভেতরে আস।

রেবেকা ভেতরে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, আরে, এ তো বড়ো সুন্দর মেয়ে! শ্যামলা রঙের মধ্যে এত সুন্দর কোনো মেয়ে তো আর্মি জীবনে দেখি নি। কী নাম তোমার খুকি?

রেবেকা।

বাহ্, নামও তো খুব সুন্দর। এস, আমার কাছে এসে বস। এত লজ্জা কেন তোমার, খুকি?

ভদ্রলোক একটা কালো ব্যাগ খুলে লাল রংয়ের একটা কলম বের করলেন। কলমের ভেতর ব্যাটারি লাগান, সুইচ টিপলেই আলো বের হয়। সেই আশোয় অন্ধকারে লেখা যায়।

এই কলমটা নাও রেবেকা। আরে বোকা মেয়ে, এত লজ্জা কিসের! নাও নাও। আর শোন, তুমি কাল এক বার আসবে, তোমার ছবি তুলব। আসবে কিন্তু।

রেবেকা গিয়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন না। পরে সে আরো অনেক বার গিয়েছে, কোনো বারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। তিনি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন। দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর সময় কাটছিল।

সুরাইয়ার কাছে যেদিন শুনল বদি চাচা চলে গেছেন, এমন মন খারাপ হল তার। বেশ মনে আছে, সে টিফিন পিরিয়ডে খানিকক্ষণ কেঁদেছিল।

পাশা চৌধুরীর সঙ্গে সুরাইয়ার চাচার চেহারায় কোথায় যেন একটা মিল আছে। মিলটি কোথায় রেবেকা ধরতে পারল না। তার কেমন জানি অস্বস্তি লাগতে লাগল। যেন মিল থাকাটা ঠিক নয়।

রিনরিন শব্দে কলিং-বেল বাজছে। দুটি ব্রাউন পেপার ব্যাগ হাতে পাশা দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা গায়ে বরফ। খুব বরফ পড়ছে বাইরে।

আমার রান্না কেমন তা তো বলছেন না, শুধু খেয়েই যাচ্ছেন।

খুব ভালো রান্না। চমৎকার রান্না।

কাঁচা মরিচ পেলে আরো ভালো হত। কাঁচা মরিচ পাওয়া যায় না এদেশে, তাই না?

পাওয়া যায়। মেক্সিকো থেকে আসে। আমার কিনতে মনে ছিল না। পরের বার কিনব।

হাত ধুতে-ধুতে রেবেকা নিচুস্বরে বলল, আপনি যখন ছিলেন না, তখন আমি একটা অন্যায় করেছি। ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু না বললে আমার খারাপ লাগবে।

পাশা অবাক হয়ে বলল, কী অন্যায়? রাগ করার মতো অন্যায় করার এখানে কোন সুযোগ তোমার নেই। ব্যাপারটা কী বল।

রেবেকা চোখমুখ লাল করে বলল, দেশ থেকে আপনার যে চিঠিগুলো এসেছে, সেগুলো পড়ে ফেলেছি।

পাশা শব্দ করে হাসল।

হাসছেন কেন?

হাসি আসছে তাই হাসছি। তুমি বেশ অদ্ভুত মেয়ে তো রেবেকা।

মজার কী দেখলেন আপনি?

পাশা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, চিঠিগুলো পড়তে কেমন লাগল?

আপনার ভাইয়ের চিঠিটা খুব মজার।

গত পনের বছর ধরে এই রকম চিঠি পাচ্ছি, একই ভাষা, একই বক্তব্য। তবে এবার ভাষা বা বক্তব্য দুটোই বদলাবে।

কেন?

টাকা পাঠান হয় নি।

পাঠান নি কেন?

আমার একটা দুঃসময় যাচ্ছে।

কী দুঃসময়?

আমি কোনো চাকরিবাকরি করি না। ভিডিও গেম-এর সফটঅয়ার তৈরি করে বিক্রি করি। বেশ কিছু দিন ধরে কিছু বিক্রি করতে পারছি না।

রেবেকা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি কী করেন আমি বুঝতে পারলাম না।

অন্য এক দিন বুঝিয়ে দেব।

আজকে বোঝাতে আপনার অসুবিধাটা কী?

না, কোনো অসুবিধা নেই।

আপনার ধারণা আমি খুব বোকা মেয়ে?

না, সেরকম ধারণা হবে কেন?

জানেন, আমি সব কটি পরীক্ষায় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পাচ্ছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। প্রফেসর ওয়ারডিংটন আমাকে কী বলেছেন শুনতে চান?

শুনতে চাই।

প্রফেসর ওয়ারডিংটন বলেছেন–আমার মতো ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে তিনি খুব কম দেখেছেন। কি, আমার কথা বিশ্বাস হল না?

বিশ্বাস হবে না কেন?

তাহলে আপনি এমন মুখ টিপে হাসছেন কেন?

আর হাসব না।

বাইরে গাড়ি হন দিচ্ছে। মার্থা এসে গেছে। রেবেকা কোট গায়ে দিতে-দিতে বলল, আসছে উইকএেণ্ড আপনি নিজে গিয়ে যদি আমাকে না আনেন, তাহলে কিন্তু আমি আসব না।

আমি নিজে গিয়েই আনব।

চারটার সময় আমাদের ক্লাস শেষ হয়। আপনি অবশ্যই পাঁচটার মধ্যে চলে আসবেন।

আসব। পাঁচটার মধ্যেই আসব।

আর, অনেকক্ষণ বকবক করলাম, কিছু মনে করবেন না।

ঠিক আছে, মনে করব না।

পাশা তাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। গুঁড়িগুঁড়ি তুষার পড়ছে। রেবেকা অবাক হয়ে বলল, বরফ পড়ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

কী সুন্দর।

পাশা সহজ স্বরে বলল, আমেরিকার এই একটি জিনিসই সুন্দর।

রেবেকা পা ফেলছে খুব সাবধানে। প্রথম রাতেই পাশা তাকে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে। প্রথমে গোড়ালি। তারপরে পা।

সারারাত ধরে তুষারপাত হল। ছ ইঞ্চি বরফে ঢেকে গেল ফাগো শহর। এক রাতের ভেতর তাপমাত্রা নেমে গেল শূন্যের পনের ডিগ্রী নিচে। ক্রিসেন্ট লেকের পানি জমে যেতে শুরু করল। ফাগগাবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হল। হোয়াইট ক্রিসমাস হবে এবার। এর আগের বছর ক্রিসমাসের সময় কোনো বরফ ছিল না। আচমকা খানিকটা গরমে সমস্ত বরফ গলে প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে গিয়েছিল। এরা বলে ইণ্ডিয়ান সামার। কেন বলে কে জানে?

৮. প্রফেসর ওয়ারাডিংটন

প্রফেসর ওয়ারাডিংটন বললেন, রেবেকা, লাঞ্চ-ব্রেকের সময় তুমি কি আমার ঘরে এক বার আসবে?

ওয়ারডিংটনের মুখে মিটিমিটি হাসি। যেন রহস্যময় কোন ব্যাপার আছে তাঁর ঘরে।

এক জন অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে।

কে?

তা বলব না। সে তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ হিসাবেই থাক। আগেভাগে কিছু বলতে চাই না।

লাঞ্চ-ব্রেক পর্যন্ত আবোলবোল অনেক কিছু ভাবল রেবেকা। এমনকি এক বার কল্পনা করল, নাসিম এসে বসে আছে। যেন কোনো অদ্ভুত উপায়ে ব্যবস্থা করে চলে এসেছে। সে ঢুকে দেখবে ঘিয়ে পাঞ্জাবি-পরা একটি মানুষ, যার কথাবার্তা আশ্চর্য রকমের কোমল এবং যে কিছুক্ষণ পরপরই টেবিলে আঙুল দিয়ে ঠক ঠক ঠক করে। এই অভভ্যসটি সে কোত্থেকে জুটিয়েছে কে জানে!

ওয়ারডিংটনের ঘরে ষাট বছর বয়েসী এক বুড়ি বসে ছিল। তার গায়ে দারুণ চকমকে পোশাক। ঠোঁটে কড়া মেরুন রঙের লিপস্টিক। সে বিরক্ত মুখে ক্রমাগত সিগারেট টানছে।

ওয়ারডিংটন বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই–এ হচ্ছে লুসি, আমার স্ত্রী। এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম। আর এই মেয়েটি রেবেকা। বাংলাদেশ থেকে এসেছে।

লুসি চোখ নাচাল। ওয়ারডিংটন বললেন, এই মেয়ের হাতের ডিজাইনের কথাই বলছিলাম। বিয়ের সময় এরা হাতে এই ডিজাইন করে। রেবেকা হাত মেলে ধর।

রেবেকা হাত মেলে ধরল। লুসি তীক্ষ চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

লুসি, তুমি ছবি তুলবে বলছিলে। ছবি তোল।

লুসি নিতান্ত অনিচ্ছাতেই ছবি তুলতে গেল। যেন তার নিজের কোন ইচ্ছা নেই। নেহায়েতই স্বামীকে খুশি করা। রেবেকার মন খারাপ হয়ে গেল। এক জন বুড়ি মুখ ব্যাজার করে তার ছবি তুলছে–দৃশ্যটি সুখের নয়।

বুঝলে লুসি, এরা বিশ্বাস করে, এই ডিজাইন যত বেশি দিন থাকে, এরা বিবাহিত জীবনে ততই সুখী হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, এই মেয়েটির হাতে অনেক দিন ধরে আছে। এ খুব সুখী মেয়ে। তাই না রেবেকা?

রেবেকা বলল, আমি কি এখন যেতে পারি স্যার?

না, পার না। চেয়ারটায় বস। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

রেবেকা বসল।

ওয়ারডিংটন হাসিমুখে বললেন, তুমি কি ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ, ডি প্রোগ্রামের ব্যাপারে উৎসাহী?

রেবেকা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি তোমার কথা ফ্যাকাল্টিতে আলাপ করেছি। তুমি যদি উৎসাহী হও তাহলে তোমাকে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে নেওয়া যাবে।

রেবেকা কী বলবে ভেবে পেল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। কিন্তু আমার নিজের কাছে একটি ফাণ্ড আছে। মাকো তেল কোম্পানির ফাণ্ড। সেখান থেকে তোমাকে আমি রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসেবে গ্রান্ট দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি ভেবেটেবে আমাকে বলবে। অবশ্যি খুব একটা সময়ও হাতে নেই। স্প্রিং কোয়ার্টারে এনরোল্ড হতে হলে কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাকে এ্যাপ্লাই করতে হবে।

রেবেকা বসে-বসে ঘামতে লাগল। বলে কি এই বুড়ো? সে করবে পি-এইচ. ডি? যার অনার্স এবং এম. এস-সি দুটোতেই সেকেণ্ড ক্লাস, তাও শেষের দিকে।

শোন রেবেকা, আমার মনে হয় না তোমার সরকার বা তোমার অফিস এতে কোনো আপত্তি করবে। বিনে পয়সায় তারা এক জনকে ট্রেইণ্ড করতে পারছে। ঠিক না?

জি-স্যার, ঠিক।

আমি যদি রেবেকা হতাম, তাহলে খুব খুশি হয়েই রাজি হতাম। এটা আমার মনে হয় বেশ একটা ভালো সুযোগ।

স্যার, আমি রাজি।

এখনই রাজি হবার দরকার নেই, তুমি ভেবে দেখা সময় আছে।

প্রফেসর ওয়ারডিংটন ড্রয়ার খুলে কিছু ফরম্ বের করলেন।

তোমার জন্যে ফরম্ আনিয়ে রেখেছি। মনস্থির করে এগুলো ফিলআপ করবে। তোমার সঙ্গে সার্টিফিকেটগুলো কি আছে?

জ্বিনা স্যার। ঐসব তো আনি নি।

সার্টিফিকেটগুলোর ফটোকপি নিশ্চয়ই আছে। তোমার কাছে না থাকলেও আমাদের কাছে আছে। শর্ট কোর্সে এনরোল্ড হবার আগে তোমাকে এসব পাঠাতে হয়েছে। কাজেই সার্টিফিকেটের কপি যোগাড় করতে কোনো অসুবিধা নেই।

রেবেকা চুপ করে রইল।

আমার উৎসাহ দেখে তুমি আবার ভাবছ না তো যে, তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। আমার স্ত্রীকে তো দেখছ, শক্ত মহিলা। হা-হা-হা! কি লুসি, ঠিক বলছি না?

লুসি হাই তুলল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এ ধরনের কথাবার্তায় তার কোনো উৎসাহ নেই।

রেবেকা বলল, স্যার, আমি এবার আসি?

ঠিক আছে, যাও।

বুড়িটিকেও এখন আর খারাপ লাগছে না। ভালোই লাগছে। বুড়ি তার দিকে হাত বাড়াল।

গুড লাক, রেবেকা।

থ্যাঙ্ক ইউ।

বুড়ি রেবেকা উচ্চারণ করল খুব পরিষ্কারভাবে, অবিকল বাঙালী মেয়েদের মতো।

ছবি ডেভেলপ করলেই তোমাকে পাঠান হবে।

রেবেকা দ্বিতীয় বার বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

বাকি দিনটা কাটল উত্তেজনার মধ্যে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক আগের কয়েক ঘন্টা যেরকম লাগে সেরকম কোনো কিছুতেই মন বসছে না। সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট, ছাড়া-ছাড়া, বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথাবোধ।

মেইল বক্সে চিঠি আছে। দেশের চিঠি। খামের ওপরের লেখা দেখে মনে হয় টুটুলের লেখা। কিন্তু কেন যেন খুলে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আরিয়ে রত্মা এক বার জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার? সে আরিয়ে রত্নাকে কিছু বলল না। ড. রেলিংএর ফুড পয়জনিংয়ের লেকচারের কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। শুধু আবদুল্লাহ্ যখন উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, ফুড পয়জনিং দরিদ্র দেশে হয় না। কারণ দরিদ্র দেশে ফুডই নেই। দরিদ্র দেশের মানুষ যা খায়, সবই হজম করে ফেলে। হা-হা- হ্যাঁ। তখন রেবেকা খানিকটা সচেতন হল। কারণ ড. রেলিং তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

রেবেকা, দরিদ্র দেশের প্রতিনিধি হিসেবে এ প্রসঙ্গে তোমার মতামত কী?

রেবেকা চোখমুখ লাল করে বলল, বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ নয়।

বেশ বড় রকমের একটা হাসির হল্লা উঠল চারিদিকে। রেবেকা দাঁড়িয়েই রইল। হাসির কারণ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে না। ড. রেলিং বললেন, বেশ, তুমি তাহলে একটি ধনী দেশের প্রতিনিধি হিসেবেই তোমার মতামতটা বল।

আবার একটা হাসির হল্লা। ড. রেলিং নিজেও হাসছেন। রেবেকার চোখের সামনে হঠাৎ সব ঝাপসা হয়ে উঠতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছে, এখন আর তার কিছু করার নেই। চোখের পানি আটকাবার আর কোনো পথ নেই।

সমস্ত ক্লাস নিঃশব্দ। ড. রেলিং হতভম্ব। সামান্য রসিকতায় একটি বয়স্ক মেয়ে এইভাবে কাঁদতে পারে তা তিনি কল্পনাও করেন নি।

মি ইন হাত ধরে রেবেকাকে বসাল। রুমাল এগিয়ে দিল তার দিকে। এই ছোটখাট মেয়েটি কখনোই ক্লাসে কোনো কথাবার্তা বলে না। গুছিয়ে কিছু বলার মতো ইংরেজি জ্ঞানও তার নেই। কিন্তু সে শান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে চমৎকার ইংরেজিতে বলল, চীন দেশ এক সময় দরিদ্র ছিল। সবাই হাসাহাসি করত মহান চীনকে নিয়ে। তাতে মহাচীনের কোনো ক্ষতি হয় নি। একটি দেশ যতই দরিদ্র হোক, তাকে নিয়ে রসিকতা করার স্পর্ধা কারোর থাকা উচিত নয়।

ড. রেলিং কুইজের কাগজপত্র দিয়ে দিলেন। বারবার রুমাল চোখের উপর চেপে ধরে প্রশ্নের উত্তর লিখল রেবেকা।

সুন্দরভাবে যেদিনটি শুরু হয়েছিল, কী কুৎসিতভাবেই না তা শেষ হচ্ছে।

বাড়ি থেকে আসা চিঠিটা অনেক মোটা। অনেকগুলি বাড়তি টিকিট সেখানে। সেই চিঠিও খুলে পড়তে ইচ্ছা করছে না। রেবেকা তার চব্বিশ বছরের জীবনে এত লজ্জিত, এত অপমানিত বোধ করে নি। কুইজ জমা দেবার সময় ড. রেলিং বললেন, রেবেকা, আজ বিকেলে আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাওয়ার সময় কি তোমার হবে?

হবে, স্যার।

বেশ, মেমোরিয়াল ইউনিয়নে চলে আসবে। ক্লাস শেষ করেই চলে আসবে। পরীক্ষা মেন দিলে?

ভালো।

কেমন ভালো? বেশ ভালো?

হ্যাঁ, বেশ ভালো।

তুমি বেশ স্মার্ট মেয়ে। আই লাইক ইউ।

রেবেকা কিছু বলল না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল, কিছুই ভালো লাগছে না। এমন কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আরেক বার কেঁদে ফেলবে।

মেমোরিয়েল ইউনিয়ন ফাঁকা। আবহাওয়ার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। ড. রেলিং বিরাট এক কাপভর্তি কফি এবং দুটো ডোনাট নিয়ে বসে আছেন। রেবেকা তার সামনে এসে বলল।

কই, তোমার কফি কোথায়?

আমি কফি খাই না, স্যার।

অন্য কিছু খাও। চা খাও।

আমার স্যার খেতে ইচ্ছা করছে না।

কথায় কথায় স্যার বলছ কেন তুমি? তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমাকে নাম ধরে ডাকবে।

রেবেকা কিছু বলল না। ড. রেলিং কফির কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, আজ তুমি কিছুটা অপমানিত বোধ করেছ বলে আমার ধারণা। আমি তার একটি প্রধান কারণ। তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কাউকে অপদস্থ করা আমার পেশা নয়। তবে রেবেকা, কোনো ব্যাপারেই এত সেনসিটিভ হওয়া ঠিক না। বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ, এটা তুমি নিজেও খুব ভালো করে জান। আমরা সবাই জানি। জানা সত্ত্বেও দেশকে দরিদ্র বললে তুমি একটা শিশুর মতো আচরণ করবে এটা ঠিক না। এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক আগে একটি বাংলাদেশী আণ্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র তোমার মতোই শিশুসুলভ আচরণ করেছিল। তার দেশ সম্পর্কে কে যেন কী বলেছে, সে ঘুষি মেরে তার দুটি দাঁত ভেঙে ফেলেছে। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল ব্যাপারটা।

ড. রেলিং দম নেয়ার জন্যে থামলেন। রেবেকা কী বলবে বুঝতে পারল না। ড. রেলিং গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, আমি স্বীকার করলাম, তোমরা তোমাদের দেশকে দারুণ ভালোবাস। অথচ আমি যত দূর জানি, তোমাদের দেশে সামরিক শাসন চালু আছে। যে-দেশের মানুষ তার দেশকে এত ভালোবাসে, তারা কী করে সামরিক শাসন চুপচাপ মেনে নেয়। এবং আমি শুনেছি, যে-ব্যক্তিটি তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়ক, তাকে সপরিবারে মেরে ফেলা হয়েছে এবং কেউ একটা কথাও বলে নি। আমি যা বলছি তা কি সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

তোমাদের দেশের প্রতি যে ভালোবাসা তা কেমন ভালোবাসা, বল তো রেবেকা?

রেবেকা চুপ করে রইল।

চল, ওঠা যাক। আবহাওয়ার অবস্থা ভালো নয়। যে-হারে বরফ পড়ছে, তাতে মনে হয় আগামীকাল রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। উইকএণ্ড শুরু হবে এক দিন আগে। তুষারপাতের দৃশ্যটি তোমার কাছে কেমন লাগে রেবেকা?

অপূর্ব!

তোমার দেশে এত সুন্দর দৃশ্য কি আছে?

আমাদের দেশের বৃষ্টিও খুব সুন্দর।

তবুও তোমার দেশই থাকবে শ্রেষ্ঠ? হা-হা-হা।

রেবেকাও হাসতে থাকল। তার মনের গ্লানি কেটে যেতে শুরু করেছে। কী অপূর্ব একটি দৃশ্য বাইরে। লক্ষ লক্ষ শিমূল গাছের তুলেবিচি হঠাৎ করে যেন ফেটে গেছে।

শিশুদের দল রাস্তায় নেমে গেছে। বরফের বল বানিয়ে এক জন অন্য জনের গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। বল যার গায়ে লাগছে, সে যথেষ্ট ব্যথা পাচ্ছে বলেই মনে। হয়। কিন্তু কাঁদছে না।

কিছুক্ষণ পরপর সবাই মিলে নরম বরফে গড়াগড়ি করছে। ড. রেলিং বললেন, এই জাতীয় কোন দৃশ্য কি আছে তোমাদের দেশে? এরকম গড়াগড়ি করার দৃশ্য?

রেবেকা হাসিমুখে বলল, উৎসবটুৎসব উপলক্ষে মাঝে মাঝে মাটিতে পানি ঢেলে কাদা তৈরি করা হয়, তারপর সবাই মিলে সেই কাদায় গড়াগড়ি করে।

সেই দৃশ্যটি এত সুন্দর?

না, এত সুন্দর না।

যাক, তাহলে একটি দিকে আমরা জিতে রইলাম।

ড. রেলিংগলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। রেবেকাও হাসতে শুরু করল। এখন তার চমৎকার লাগছে।

রাত নটার মধ্যে এক ফুট বরফ পড়ল। আবহাওয়া দফতর বলল, বাকি রাতে আরোদু ফুটের মতোবরফ পড়তে পারে। তুষারঝড়ের একটা আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। ঘন্টায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর কিলোমিটার বেগে গাস্টি উইণ্ড হবার কথা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বের না হবার পরামর্শ দেওয়া হল।

রেবেকা সকাল-সকাল শুয়ে পড়ল। টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে খাম খুলল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, চিঠিটার কথা তার মনেই ছিল না। ঘুমুতে যাবার আগমুহূর্তে মনে পড়েছে। চিঠি লিখেছে টুটুল। টুটুল এত গুছিয়ে লিখতে পারে, তা রেবেকা কল্পনাও করে নি।

ছোট আপা,

কেমন আছ তুমি?

সবাইকে বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছ, কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন লাইনের নোট। আমি কী দোষ করলাম? আমি অনেক চিন্তা করে নিজের একটা দোষ খুঁজে পেয়েছি। এয়ারপোর্টে তোমাকে বিদায় দিতে এসে সবাই কাদছিল, শুধু আমি কাদি নি। এই জন্যেই কি আমাকে ছোট চিঠি?

কিন্তু হোট দুলাভাইও তো কাঁদেন নি। তাকে তুমি ঠিকই লম্বা- চিঠি লিখছ। এর মধ্যে তাকে তিনটি চিঠি লিখে ফেলেছ। তার মধ্যে একটি চিঠি ফরিদা আপা চুরি করে নিয়ে এসেছে। এবং সবাই পড়েছে। এমন কি মা-ও পড়েছে। সেই চিঠি নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছে। ছোট দুলাভাই ফরিদা আপার ওপর খুব রাগ করেছেন।

যাই হোক, হোট দুলাভাই প্রায়ই আমাদের বাসায় আসেন। সাধারণত রাতের বেলা খাবার সময়টায় আসেন। খাওয়াদাওয়ার পর গল্প করতে-করতে এগারটা বাজিয়ে ফেলেন। তখন আমরা আর তাকে যেতে দিই না।

বুঝলে আপা, তাকে প্রথম দেখে যেরকম গভীর মনে হয়েছিল, তিনি সে রকম নন। খুব গল্পবাজ। ফরিদা আপা তার নাম দিয়েছে মিঃ বকবকর। এই নিয়ে মা ফরিদা আপাকে খুব বকা দিয়েছে। দেখ তো মায়ের কাণ্ডকারখানা। আমরা দুলাভাইয়ের সঙ্গে কি বলি না-বলি, তার মধ্যেও তার থাকা চাই।

গত পরশুদিন রাতে একটা মজার কাণ্ড হয়েছে। বড়ো দুলাভাই তার ব্যবসার কাজে ঢাকা এসেছেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা বিরাট এক কাতলা মাছ কিনলেন দুশ পচাত্তর টাকা দিয়ে। সেই মাছের মাথাটা কোন জামাইকে দেবেন তা নিয়ে মা খুব চিন্তিত। গোপনে মিটিং করছেন ফরিদা আপার সঙ্গে। ঠিক করা হল, বড়ো দুলাভাইকে দেওয়া হবে।

কিন্তু কী কাণ্ড, শেষ মুহূর্তে দেখা গেল সেটা দেওয়া হয়েছে ঘোট দুলাভাইকে। বড়োপা সঙ্গে সঙ্গে মুখ কালো করে ফেলল।

ছোট দুলাভাই অবশ্যি মাছটা তুলে দিলেন বড়ো দুলাভাইকে এবং বললেন–আমি মাছের মাথা খাই না। আমার কিন্তু ধারণা, তিনি ঠিকই খান।

চিঠি পড়তে পড়তে বারবার চোখ ভিজে উঠছিল। নতুন পল্টন লাইনের সংসার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আহ্, কী গভীর আনন্দ সেখানে।

মার্থা বলল, এক চিঠি তুমি ক বার করে পড়, বল তো রেবেকা? অনেক বার।

এত সময় নষ্ট কর কেন তোমরা? আমাদের মতো করতে পার না? এই দেখ না, আমার হাসবেণ্ড আমাকে কার্ড পাঠিয়েছে।

মার্থা কার্ড এগিয়ে দিল। সেখানে একটি শুকনো ধরনের লোকের ছবি। সে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। মুখে থার্মোমিটার। নিচে লেখা প্রিয়তমা, তোমার বিরহে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। পাশেই এক বিশালবা নার্স। ছবিটি এ রকম, যেন বিরহটা নার্সের কারণেই বোঝায়।

কি রকম ফানি কার্ড, দেখলে? সে যা বলতে চাইছে বলা হল। রসিকতাও করা হল। সময় নষ্ট হল না। আমাকেও চিঠি লিখতে বসতে হবে না। আমিও একটা কার্ড কিনে পাঠাব। সেখানেও ফানি কিছু লেখা থাকবে।

কিন্ত সে লেখাগুলি তো অন্যের। তোমার নিজের কথা তো নয়।

সেইসব কাউই কিনবে যার লেখাগুলো তোমার নিজের লেখা বলে মনে হয়। তাহলেই হল। তাছাড়া যারা এইসব কার্ড লিখছে, তারা দারুণ বুদ্ধিমান লোক। মনের ভাব এরা অনেক গুছিয়ে বলতে পারে।

তারা রাত এগারটার দিকে ঘুমুতে গেল। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না রেবেকার। তার বারবার ইচ্ছা করতে লাগল ড. ওয়ারডিংটনের এই খবরটি পাশা নামের মানুষটিকে জানাতে।

এত রাতে টেলিফোন পেলে সে কি বিরক্ত হবে? বোধহয় হবে না। কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয়, এরা কখনই কোনো কারণে বিরক্ত হয় না। নাসিম সেরকম এক জন মানুষ।

মার্থাকে সঙ্গে নিয়ে তার জন্যে মজার একটা কার্ড কিনলে কেমন হয়? ফরিদা কোনট-না-কোনোভাবে সেটা চুরি করে ফেলবে। সবাইকে দেখিয়ে আরেক কাণ্ড করবে।

৯. দেশ থেকে আসা কোনো চিঠি

দেশ থেকে আসা কোনো চিঠিই পাশা দু বার পড়ে না।

দু বার পড়ার মতো কিছু কোনো চিঠিতে থাকে না। পত্রলেখকের নাম পড়ে বলে দেওয়া যায়, কী লেখা আছে চিঠিতে।

দেশের অবস্থা ভালো না।

দেশে আসবার কথা চিন্তা করা মহা বোকামি।

এখান থেকে কাউকে গ্রীন কার্ড দেওয়া যায় কিনা দেখ।

কিছু ডলার পাঠান কি সম্ভব হবে? অত্যন্ত অসুবিধায় আছি।

এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান ভঙ্গিমায় লেখা থাকে। এর বাইরে যেন দেশের মানুষদের আর কিছু বলার নেই।

এবারে বড় ভাইয়ের চিঠিটা অবশ্যি একটু অন্য রকম। দীর্ঘ চিঠি। পাশা দু বার পড়ল। বহুদিন পর একটি চিঠি দু বার পড়া হল।

গত মাসে তোমার কোনো ড্রাফট পাই নাই।

অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত আছি। মনে হয় ড্রাফটা মিসিং হয়েছে। কুদ্দুস সাহেবের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ হয়েছে। তারও ধারণা ড্রাফট মিসিং হয়েছে। আজকাল এ রকম প্রায়ই হয়। চোরের দেশ। পোস্টঅফিসের ফরেন অফিসের এ ব্যাপারে হাত আছে। ড্রাফট তাদের পছন্দসই লোকের হাতে চলে যায় এবং তা বিনা ঝামেলায় যথাসময়ে ভাঙান হয়। টাকা খাওয়াতে হয়। টাকার খেলা।

আমি খোঁজখবর করবার জন্যে লোক লাগিয়েছি। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, আমার শালার এক চাচাতো ভাই জিপিওতে কাজ করেন। অফিসার র্যাঙ্ক। আমি গত বুধবার তার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি যথেষ্ট খাতির-যত্ন করলেন এবং আমাকে বললেন, ব্যাপারটা সপ্তাহখানিকের মধ্যে দেখবেন। তবে তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, ড্রাফটের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার ইত্যাদি পাঠানর জন্যে।

কাজেই তুমি আমার এই চিঠি পাওয়ামাত্র অতি অবিশ্যি ড্রাফটের রেজিষ্ট্রেশন নার পাঠাবে। সবচে ভালো হয় যদি রশিদের একটা ফটো-কপি পাঠাতে পার। কিছুমাত্র বিলম্ব করবে না। আমি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত আছি।

ভালো কথা, তুমি মিতার নামে যে এক শ ডলার পাঠিয়েছ, তা সে পেয়েছে। এতগুলি টাকা ওদেরকে পাঠানর কী কারণ বুঝলাম না। বিয়ের পর আমি সাড়ে তিন শত টাকা দিয়ে একটা মেরুন কালারের জামদানি শাড়ি দিয়েছি। আমার দেওয়া মানেই তোমার দেওয়া। কাজেই এইখানে আলাদা করে এতগুলি টাকা পাঠানর কোনো কারণ দেখি না।

যদি মনে কর এইভাবে দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবে তাহলে ভুল করবে। সেটা সম্ভব না। এক জনকে কিছু দিলেই সবাই ছেকে ধরবে। তুমি কত জনকে দেবে?

সবচে বড়ো কথা, মিতা যে এক শ ডলার পেয়েছে, এই ঘটনাটা সে আমাকে জানায় নাই। আমি অন্য লোকের মারফত খবর পেলাম। এখন তুমিই বল, আমাকে না জানানর কারণ কী? আমি কি টাকাটা নিয়ে নিতাম? এই হচ্ছে এদের মানসিকতা। ছিঃ ছিঃ।

তোমার বিবাহের ব্যাপারে এক জায়গায় আলাপের কথা ভাবছি। মেয়ের বাবা রিটায়ার্ড এস পি। ঢাকা শহরে নিজের তিনতলা বাড়ি আছে। ভদ্রলোকের দুই মেয়ে,

কোনো ছেলে নাই। বাবার সম্পত্তির মেয়েরাই ওয়ারিশান। মেয়ে দেখতে খারাপ না। লম্বা চুল। এই বিষয়ে তোমার মতামত জানাবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, ডাফটির ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোঁজ নিবে। আমরা একমতো আছি।

পাশা লক্ষ করল–এই প্রথম বড়ো ভাইয়ের চিঠি থেকে তোমার ভাবীর শরীর ভালে যাচ্ছে না–এই লাইনটি বাদ গেছে।

সে বড় ভাইয়ের বর্তমান অবস্থাটি কল্পনা করতে পারে। চিন্তিত মুখে রোজ এক বার পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। কুদ্দুস সাহেবের কাছে যাচ্ছেন ডলারের দর জানবার জন্যে। বাড়িতে আসছেন মেজাজ খারাপ করে। একটি ড্রা যথাসময়ে না আসায় গোটা পরিবার শঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছে।

যখন এরা সত্যি-সত্যি জানবে ড্রাফট মিসিং হয় নি, তখন কী হবে? বাংলাদেশের আরো কিছু পরিবারের মত তাদের এই পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা নির্দিষ্ট তারিখে আসা

ড্রাফটের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই পরিবারের কর্তা ড্রাফট ভাঙানর কলাকৌশল ছাড়া অন্য কিছুই তেমন জানেন না।

এক জন দুর্বল পিতার ঔরসে সবল পুত্র-কন্যারা জন্মাতে পারে না। পাশা চৌধুরীর বাবা নিজাম চৌধুরী এক জন দুর্বল মানুষ ছিলেন। ফুড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের হেডক্লার্ক নিজাম চৌধুরীর জীবনের একমাত্র সাফল্য ছিল–পরিচিত এক অসুস্থ ব্যবসায়ীর হয়ে বদলিহজ্ব করা। নিজাম চৌধুরী এই ব্যাপারটি ঠিক কীভাবে ম্যানেজ করেছিলেন, সেটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু এই সাফল্যে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। জীবনের বাকি কটা দিন তাঁর কাঁটল হজ্বের গল্প করে।

আরে ভাইসাব, কী দেশ। কী খাওয়া-খাদ্য, কী ফলফলারি। সব কিছু বেসমার। আর পানির কথা কী বলব ভাইসাব। কী পানি। ভরপেটে এক ঢোক পানি খান–সব হজম। সঙ্গে সঙ্গে খিদা লাগে। আল্লাহ্ পাকের খাস রহমত আছে। পানির উপরে।

হযরে আছোয়াতে যখন চুমু দিলাম–বুঝলেন ভাইসব, শরীরের ভেতর দিয়ে একটা ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। হাই ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি। এই দেখেন, গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। হাত দিয়ে দেখেন। চুমু দিয়ে চোখে পানি এসে গেল। আহ কী রহমত, আল্লাহ পাকের কী নিয়ামত। ফাবিয়ে আলা রাৰি তুকাজজিবান।

কাবা শরিফের গল্প করে বাকি জীবনটা পার করে দিতে পারলে ভালেই হত। কিন্তু নিজাম সাহেব একটা ঘুষের মামলায় পড়ে গেলেন। জেল-জরিমানা হয়ে যেত। হযরে আছোয়াতে চুমু খাওয়ার পুণ্যেই হয়ত চাকরিটা গেল। জিপি ফাণ্ডের টাকা, পেনসনের টাকা–এই সব বের করবার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলেন।

পাশার বড়োভাই সেই কষ্টে যোগাড় করা টাকায় নানা রকম অদ্ভুত ব্যবসা ফাঁদতে লাগলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক-বাবার চাকরি চলে যাওয়াতে শাপে বর হয়েছে। ব্যবসা করে সংসারের অবস্থা পাল্টে ফেলার সুযোগ পাওয়া গেছে। নিজাম চৌধুরীও জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধারণা সমর্থন করতেন। কথায় কথায় বলতেন, ব্যবসার মতো জিনিস আছে নাকি? রসুলে করিম নিজে ব্যবসা করেছেন। রুজি রোজগারের আশি ভাগই হচ্ছে ব্যবসাতে। দেখ না এখন সংসারের কী অবস্থা হয়।

সংসারের অবস্থা দেখার মতোই হয়। দু বেলা রুটি এবং ডালের ব্যবস্থা হয়। নিজাম সাহেব খেতে বসে দু বেলাই ছোটখাট একটা ভাষণ দেন, ডাল-রুটির মতো পুষ্টি কোনোটাতেই নাই। মারাত্মক পুষ্টি। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট–সব এর মধ্যে আছে। ভাতের মধ্যে পানি ছাড়া আর কী আছে? বাঙালী জাতির সর্বনাশ হয়েছে ভাত খেয়ে।

নিজাম সাহেবের নিজের তিন ছেলের উপর বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাঁর ধারণা ছিল, এরা একটা কিছু করে দাঁড়িয়ে যাবে। সেই ধারণা প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা হল মেজ ছেলেকে দিয়ে।

সে বি.এস-সি পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ ঘঘাষণা করল পরীক্ষা দেবে। না, কারণ বড় পীর সাহেব আবদুল কাদের জ্বিলানি তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন পরীক্ষাটরীক্ষার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে আল্লাহর পথে যাওয়ার জন্য। সে স্বপ্নে বড়ো পীর সাহেবের কাছ থেকে দোয়া পেয়েছে–যা প্রতি দিন পড়তে হবে ত্রিশ হাজার বার। শুধু বৃহস্পতি বার রাতে পড়তে হবে সত্তর হাজার বার।

এর মধ্যেও নানান রকম ফ্যাকড়া দেখা দিতে লাগল। যেমন সে হঠাৎ মেয়েদের দিকে তাকান বন্ধ করে দিল। কারণ মেয়েদের দিকে তাকালে পাপ হয়। কোনো মেয়ের গলা শোনামাত্র সে দু হাতে চোখ ঢেকে ফেলত।

এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, একটি হত-দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে, নিজাম সাহেব ছেলের বিয়ে দিলেন। বাসার সবাই প্রায় নিশ্চিত, এইবার ছেলের মতিগতি ফিরবে। এবং ফিরলও। সে তার স্ত্রীর শাড়ি, গয়না ইত্যাদির ব্যাপারে অতিরিক্ত রকমের আগ্রহী হয়ে উঠল। দিনরাত এইসব নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করতে লাগল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার–এত লোক থাকতে মাজেদাকে দিয়ে সব কাজ করা হয়, এর মানে কী? এর মানে কী আমি জানতে চাই।

দু বছরে তাদের তিনটি ছেলেপূলে হল (প্রথম বার যমজ কন্যা) এবং এর পরপরই নিজাম সাহেবের মেজ ছেলে এক পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে বড় ভাইয়ের সঙ্গে রাগ করে মসজিদে ঘুমুতে গেল। মসজিদের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে এক রাতের মধ্যেই কালান্তক নিউমোনিয়া বাধিয়ে ফেলল।

হাসপাতালের শেষ কটা দিন তার বড়ো অস্থিরতায় কেটেছে। বারবার উঠে বসে বিহ্বল সুরে বলেছে, মাজেদা, ও মাজেদা–তোমাকে বড়ো ঝামেলায় ফেলে যাচ্ছি। কী করি বল তো? কী করা যায় এখন?

পাশা হোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মেজ ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের কোনো খবর বড় ভাইয়ের চিঠিতে থাকে না। ওরা কেমন আছে? কত বড় হয়েছে? মাজেদা ভাবীই-বা কেমন

আছেন? ড্রাফট না পাওয়ার দুঃশ্চিন্তা তাঁকে কী রকম কাবু করেছে? তিনিও কি তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে শুকনো মুখে ঘুরঘুর করছেন?

টেলিফোন বাজছে।

পাশা এগিয়ে গেল। কে টেলিফোন করেছে? রেবেকা? সময়ে-অসময়ে এই মেয়ে ফট করে একটা টেলিফোন করে বসে। তার নিরিনে গলা শোনা যায়। হ্যালো শোনেন, পাশা ভাই, বাংলায় কথা বলার জন্যে ফোন করলাম।

ভালো করেছ, এখন কথা বল।

আজ বাসা থেকে কটা চিঠি পেয়েছি বলেন দেখি?

তিনটা।

হল না, পাঁচটা। এটা হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট রেকর্ড।

স-ব বাসার চিঠি?

হুঁ। দুটা এসেছে আমার কর্তার কাছ থেকে। একটা এসেছে আমার বড়োআপার কাছ থেকে, বরিশাল থেকে লেখা। অনেক আগে লেখা, আসতে দেরি হয়েছে কেন জানেন? জীপ কোড দেয় নি, তাই। হ্যালোপাশা ভাই।

বল।

আমাদের সামনের বাসায় এক রিটায়ার্ড জজ সাহেব থাকেন, আপনাকে বলেছিলাম না?

হ্যাঁ, বলেছিলে।

তাঁর স্ট্রোক হয়েছে। এখন পিজিতে।

তুমি মনে হয় খুব চিন্তিত।

এক জন অসুস্থ আর আমি চিন্তিত হব না? কী যে কথাবার্তা আপনারা খুব রাগ লাগে। হ্যালো, শুনুন।

শুনছি।

এই জজ সাহেবের একটি মেয়ে আছে, এত সুন্দর–মনে হয় তুলি দিয়ে। আকা।

তুমি আমাকে আগে বলেছ।

দাঁড়ান, আপনাকে ছবি দেখাব। ছবি দেখলে এই মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে যাবেন।

সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ছেলেরা বিয়ের জন্য পাগল হয়ে যায়, এটা ভাবা ঠিক না।

পাশা ভাই, আমি এখন রেখে দিচ্ছি, পরে কথা বলব।

ঠিক আছে।

ও, ভালো কথা, আজ কয়েকটা ছবি এসেছে বাসা থেকে। সব ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট।

তোমার কর্তার ছবি আছে?

হুঁ।

সেই ছবি কি আঁচলে লুকিয়ে ঘুরঘুর করছ?

হ্যাঁ, করছি। রাখলাম টেলিফোন।

আজকের টেলিফোন রেবেকার কাছ থেকে আসে নি। পাশার বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। সে ধরেই নিয়েছিল টেলিফোন এসেছে রেবেকার কাছ থেকে।

পাশা চৌধুরী?

হ্যাঁ।

আমি এ্যাপল গেমস থেকে বলছি–পিআরও। আমার নাম জন।

হ্যালো জন।

তোমার খেলাটি মনোনীত হয়েছে।

পাশা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এপল গেমস থেকে যথাসময়ে টেলিফোন না আসায় সে ধরেই নিয়েছিল, খেলাটি ওদের পছন্দ হয় নি।

জন, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে একটি ছোট সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

তোমার খেলাটি ডিপ্রেসিং ক্রিসমাস স্পিরিটের সঙ্গে খাপ খায় না। ক্রিসমাসের খেলা হবে আনন্দের। কিন্তু তোমার খেলাটিতে আনন্দের কিছু নেই। একটি নিরানন্দ বিষয় নিয়ে তুমি কাজ করেছ। আশা করি কথাটা তুমি স্বীকার করবে।

পাশা চুপ করে রইল।

যালো মিঃ পাশা।

বল, শুনছি।

তুমি কি খেলার ফরম্যাট ঠিক রেখে এটাকে একটা আনন্দের খেলায় বদলে। দিতে পার না?

তা কী করে সম্ভব?

যেমন মনে কর, একটি ছেলে নির্দিষ্ট ডলার নিয়ে এক ছুটির দিনে ডেট করতে বের হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাজেশান। তুমি অন্য ভাবেও এটা করতে পার। পার না?

পাশা জবাব দিল না।

তুমি এটা বদলে দিলে আমরা খেলাটা কিব। রাজি থাকলে টেলিফোনেই রয়েলিটির ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হতে পারে। মোট রয়েলিটির ওপর কিছু বোনাসও দেওয়া হবে। ক্রিসমাস প্রোডাকশন, সেই কারণেই বোস। তুমি কি রাজি আছ?

না। খেলাটা যেভাবে আছে, আমি সেটাকে সেভাবেই রাখতে চাই।

এ ব্যাপারে ইচ্ছা করলে তুমি একটা সেকেণ্ড থট দিতে পার।

আমি এই নিয়ে আর ভাবতে চাই না।

পাশা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার সামনে খুব একটা খারাপ সময়। জমান টাকা দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তারপর? তারপর কী? তার কোনো গ্রীন কার্ড নেই। সে অসংখ্য ইললিগ্যাল এলিয়েনদের একজন। কেউ তাকে কাজ দেবে না।

দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কী করবে সে দেশে গিয়ে? তার কোনো ডিগ্রী নেই। পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে–টাকার যোগাড় করা যায় নি। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পয়সায় পড়াশোনা করা সবার হয়ে ওঠে না। তার হয় নি, ফরিদের হয় নি। অথচ তারা দুজনই

কি আমেরিকান ছাত্রদের চমকে দেয় নি, বিশেষ করে ফরিদ? পরপর চার বার ডিনস লিস্টে তার নাম গেল। ড. টলম্যানের আগ্রহে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং মেজর বদলে তারা চলে এল কম্পুটারে, কারণ। টলম্যানের ভাষায় কম্পুটার সায়েন্সে দরকার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের।

জ্বর আসছে নাকি?

পাশা কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল। শরীর খারাপ লাগছে। টেবিলল্যাম্পের আলো চোখে লাগছে। চোখ করকর করছে।

খেলাটি বদলে দিলে হত না?

না, তা ঠিক হত না। সারা জীবন সে পরাজিত হয়েছে। আর পরাজিত হতে ইচ্ছা করছে না।

কেন করছে না?

রেবেকা মেয়েটির কারণে কি? এই শ্যামলা মেয়েটি কি কোনো বিচিত্র উপায়ে তার ভেতর অহংকার জাগিয়ে তুলেছে।

পাশা অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ল। এবং অনেক দিন পর মাজেদা ভাবীকে স্বপ্নে দেখল। ভাবী যেন খুব চিন্তিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর গোলগাল মুখটি কেমন লম্বাটে হয়ে গেছে। তিনি খুব হাসছেন।

১০. রেবেকার অভ্যেস

রেবেকার অভ্যেস হচ্ছে প্রতিদিন কম করে হলেও চার-পাঁচ বার মেইল-বক্স পরীক্ষা করা। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পায় তখনই একতলায় চলে যায়। চৌষট্টি লেখা ছোট্ট খোপটি খোলে। এই সময় তার বুক কাঁপতে থাকে। প্রথম দিকে সারাক্ষণই মেইল-বক্স ফাঁকা থাকত। তার মনে একটা সন্দেহ থাকত, হয়তো ভুলে তার চিঠি অন্য কারো খোপ চলে গেছে। সেই সন্দেহটা এখন আর হয় না। আমেরিকানরা কাজ করে নির্ভুল, এই বিশ্বাস তার হচ্ছে।

আজ বুধবার। দেশের চিঠি আসার কথা নয়। সাধারণত দেশের চিঠি আসে সোম এবং মঙ্গলবারে। তবু রেবেকার মনে হতে লাগল, তার চিঠি আছে। যেটা খুব বেশি মনে হয় সেটা সাধারণত হয় না। কাজেই সে প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করল, আজ কোন চিঠি পাওয়া যাবে না। মেইল-বক্স থাকবে ফাঁকা।

কিন্তু বেশ কয়েকটি চিঠি ছিল। এর মধ্যে একটি দেশের। খামের উপরে বাংলায় লেখা, প্রেরক ফরিদা ইয়াসমিন। শুধু প্রেরকের নাম নয়, প্রাপকের নামও লেখা বাংলায়। এদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কোনোকালে হবে না? বাংলা নামটা এখানে পড়বে কে? এরা যে বুদ্ধি করে রেবেকার মেইল বক্সে রেখে গেছে–তাই যথেষ্ট।

ফরিদার চিঠি ছাড়া আর যা এসেছে, তার সবই বোধহয় জাঙ্ক মেইল। জিনিসপত্র বিক্রি করার আমেরিকান কায়দা। তারা এই সব চিঠি কি বেছে বেছে বিদেশীদের পাঠায়? হয়তো ভাবে, বোকা বিদেশীরা এই ফাঁদ বুঝতে পারবে না। রেবেকাকে একটি চিঠি লিখেছে

সিয়াটলের এক ঘড়ি কোম্পানি, লিখেছে–মিসেস রেবেকা ইয়াসমিন, আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কারণ আপনি একটি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতাটি হয়েছে আপনার অগোচরে। আমরা সমগ্র আমেরিকার পঞ্চাশ জন ভাগ্যবান ব্যক্তির একটি তালিকা করেছি, তাতে আপনার নাম উঠেছে। আমরা আপনাকে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের কারণে একটি কোকিল-ঘড়ি পাঠাচ্ছি। জিনিসটি জার্মান কারিগর কর্তৃক হাতে তৈরী। এবং প্রায় দুশ ডলার মূল্যের এই অপূর্ব ঘড়িটি দেওয়া হবে মাত্র উনিশ ডলারে।

রেবেকা ভেবে পায় না এরা এত তাড়াতাড়ি তার নাম জানল কী করে? নাম জানার এই কষ্টটি করবার জন্যেই কি ওদের কাছ থেকে একটি ঘড়ি কেনা উচিত নয়?

আজ দুটি চিঠি এসেছে রিয়েল স্টেট বিজনেসের লোকজনদের কাছ থেকে। তারা জানতে চাচ্ছে, রেবেকা কি এখানে কোন বাড়ি কিনতে আগ্রহী? পাঁচ হাজার ডলার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে সে এই মুহূর্তে একটি বাড়ি কিনতে পারে। বাড়ির দাম মাসিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে। সুদের হার শতকরা তের ভাগ। তারা বেশ কিছু বাড়ির ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে।

এমন চমৎকার সব বাড়ি যে দেখলেই কষ্ট হয়। একটি কাঠের বাড়ি খুব মনে ধরল রেবেকার। লেকের পাশে দোতলা বাড়ি। বিশাল এক বারান্দা। সেখানে পুরনো আমলের একটি ইজিচেয়ার পাতা আছে। দেখলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। বাড়িটাকে ঘিরে আছে বিশাল পাইনগাছের সারি। ছবিটি তোলা হয়েছে বাতাসের মধ্যে, কারণ পাইনগাছগুলি এক পাশে হেলে আছে। লাল স্কার্ট-পরা একটি মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে, বাতাসে তার চুলও উড়ছে।

এই রকম একটি বাড়ি থাকলে জীবনটা কি অন্য রকম হয়ে যেত না? বিকেলবেলায় বিশাল বারান্দায় বসে চা খেত। লাল স্কার্ট-পরা মেয়েটির মতো ফুল উড়িয়ে হাঁটত পাইনগাছের নিচে। জোৎস্নারাতে তার বরকে সঙ্গে করে নৌকা নিয়ে বেড়াতে যেত হ্রদে। আহু, কী অপূর্ব জীবন এদের।

রেবেকা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে অন্য চিঠিগুলি দেখতে লাগল। একটা চিঠি এসেছে নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিনের কাছ থেকে। রেবেকাকে জানান হয়েছে যে, তাকে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে স্প্রিং কোয়ার্টার থেকে। তাকে ফ্রী টিউশন দেওয়া হয়েছে এবং এ ছাড়াও প্রতি মাসে তাকে দেওয়া হবে চার শ পঁচাত্তর ডলার। ভিসাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলি মেটার জন্যে তাকে অবিলম্বে ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সত্যি তাহলে ব্যাপারটা ঘটেছে। এবার বোধহয় খবর জানিয়ে সবাইকে চিঠি লেখা যাবে। চিঠি পড়ে ওদের কী অবস্থা হবে কে জানে? কেউ নিশ্চয়ই বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তাদের আত্মীয়স্বজনদের কেউই পি-এইচ. ডি ডিগ্রীওয়ালা নেই। দুরসম্পর্কের এক মামা আছেন এম.আর.সি.পি.। ভদ্রলোক কখনো কাউকে চিনতে পারেন না। রেবেকার তাড়াহুড়োর বিয়ের পর একটা টি-পার্টির ব্যবস্থা হল। সব আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হল। এম.আর.সি.পি, মামাকেও দেওয়া হল। টুটুলের বক্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ভদ্রলোক চিনতেই পারেন নি কার বিয়ে হয়েছে। তারপর নাকি এমন একটা ভঙ্গি করেছেন, যার মানে হচ্ছে চিনতে পারি নি, তাতে কি? পৃথিবীর সবাইকে তো আর চেনা যায় না। দেখি, সময় পেলে যাব।

শেষের অংশটা টুটুলের বানানট। সে খুব বানিয়ে কথা বলে। মামা ভদ্রলোক দাওয়াতে এসেছিলেন। বাঁশের তৈরী একটা ফুলদানি প্রেজেন্ট করেছিলেন। টুটুলের ধারণা, সেই ফুলদানিটা তিনি নিজেই বাঁশ চেছে বানিয়েছেন। টুটুল দারুণ ফাজিল হয়েছে।

গত কয়েক দিন ধরে ক্লাসগুলি কেমন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। ক্লাস শেষ হওয়ামাত্র কুইজ হচ্ছে না। এটা নাকি করা হচ্ছে ক্রিসমাসের কারণে। যাবতীয় পরীক্ষা নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্রিসমাসের পর। বিদেশীরা তাদের পড়ালেখা যাবতীয় উৎসবের বাইরে রাখে বলে যে কথাটি প্রচলিত, তা ঠিক নয়। আমরা যেমন কিছু কিছু রোজার ঈদের পরে নিয়ে যাই, এরাও তাই করে। পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারটাও তার চোখে পড়েছে। একটি আমেরিকান ছেলে বইয়ের পাতা কেটে হাঁটুর ওপর রেখে লিখছে, এই দৃশ্যটি তার নিজের চোখে দেখা।

দুপুরবেলা ড. রেলিং-এর একটা ক্লাস ছিল। কেমিকেল প্রিজারভেটিভস-এর উপর। ড. রেলিং এসে জানালেন তিনি ক্লাসটা নিতে পারছেন না। কারণ প্রচণ্ড সর্দিতে তাঁর নাক বন্ধ। তিন ঘন্টার ভেতর ছটা টাইলান খেয়েও কিছু হচ্ছে না।

রেবেকা লক্ষ করল, ক্লাস হবে না শুনে আমেরিকান ছাত্রগুলি বাংলাদেশের ছাত্রদের মতোই হৈ-হৈ করে উঠল, যেন একটি মহানন্দের ব্যাপার ঘটে গেছে। ড. রেলিং বললেন, যে-সব বিদেশী ছাত্রছাত্রী এখনো ক্রিসমাসের ডিনারের। দাওয়াত পায় নি তাদের জন্য আমরা কিছু হোস্ট যোগাড় করেছি। তাদের লিস্ট অফিসে আছে। বিদেশী ছাত্রদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন পছন্দসই হোস্ট বেছে নেয়।

রেবেকার নিমন্ত্রণ এসেছে দু জায়গা থেকে। প্রফেসর ওয়ারডিংটন এবং ড. রেলিং। কোনটিতে সে যাবে, এখন মনস্থির করতে পারে নি। খালিহাতে নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে না।

একটা কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে। কী কেনা যায় কে জানে? পাশা ভাইকে নিয়ে যেতে হবে এক বার ওয়েস্ট একারে। ক্রিসমাসের সবচেয়ে বড়ো বাজার নাকি সেখানেই।

রেবেকা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল নিজের মনে। এত সকাল-সকাল ডরমিটরিতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। ডরমিটরিতে যাওয়া মানেই নিজের ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে থাকা। এর চেয়ে বিশাল ইউনিভার্সিটিতে নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে তার বেশ লাগে।

হ্যালো রেবেকা।

রেবেকা তাকিয়ে দেখল রেড চায়নার মি ইন ছোট-ঘোট পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

রেবেকা, তুমি কেমন আছ?

একটু আগেই ক্লাসে যার সঙ্গে ছিল, সে এখন তাকে জিজ্ঞেস করছে।-কেমন আছ? রেবেকা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মি ইন বলল, চল, কফি খাই।

রেবেকা গেল তার সঙ্গে। মি ইন কোনো একটা ব্যাপারে একটু উত্তেজিত। রেবেকা বলল, আমাকে কি তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ। চল, কফি খেতে-খেতে বলব।

মি ইন যে কথাটি বলল, তার জন্যে রেবেকা ঠিক প্রস্তুত ছিল না।

রেবেকা, এরা আমাকে এই ইউনিভার্সিটিতে একটি টিচিং এ্যাসিস্টেন্টশিপ দিয়েছে। এরা চায় আমি স্প্রিং কোয়ার্টার থেকেই ক্লাস করতে শুরু করি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, চিঠিটা আমার সঙ্গেই আছে। দেখতে চাও?

না, দেখতে চাই না।

মি ইন চিন্তিত মুখে বলল, আমেরিকানরা উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করে না। এর পেছনে কোন পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

কী উদ্দেশ্য থাকবে?

সেটা বুঝতে চেষ্টা করছি। তোমাকে এই অফার দেবার পেছনে কারণ থাকতে পারে। আমাকে দেবার কারণ নেই। আমি খুবই মিডিওকার এক জন ছাত্রী।

এত ভাবছ কেন? অফার দিচ্ছে যখন, নিয়ে নাও।

নিয়ে নাও বললেই তো নেওয়া যায় না। দেখতে হবে আমার দেশ রাজি হয় কিনা। রাজি হবে না, এটা প্রায় ধরেই নেওয়া যেতে পারে।

মি ইন এই ব্যাপারটায় যথেষ্টই বিচলিত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। সে দ্বিতীয় পেয়ালা কফি নিয়ে এল। রেবেকা কিছু হালকা কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু মি ইনের মন নেই।

রেবেকা বলল, মি ইন, এই ছবিটা দেখ। কেমন চমৎকার একটা কাঠের বাড়ি, দেখলে?

হুঁ, দেখলাম।

পাঁচ হাজার ডলার থাকলেই এই বাড়িটা কেনা যায়। আমার কাছে যদি থাকত, আমি কিনতাম।

এত বড় একটা বাড়ির তোমার দরকারটা কী?

আরে, মেয়েটা বলে কি! দরকার না থাকলে বুঝি বিশাল একটা বাড়ি থাকতে পারবে না?

মি ইন বলল, ছবিতে বাড়িটা যত সুন্দর লাগছে, আসলে তত সুন্দর নয়। ছবিতে সব জিনিস ভালো দেখায়।

আমেরিকা তুমি সহ্যই করতে পার না। তাই না মি ইন?

হ্যাঁ, তাই, নোংরা আমেরিকানদের কোন কিছুই ভালো হতে পারে না।

রেবেকা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, চল না–বাড়িটা দেখে আসি। ক্রিসেন্ট লেকের পাশেই বাড়ি। কাছেই তো। একটা ক্যাব নিয়ে যাব।

পাগল নাকি তুমি।

কেন, অসুবিধা কী?

শুধু শুধু এই বাড়ি দেখে কী হবে! তুমি তো আর কিনছ না?

কিনতে ইচ্ছে করে যে

মি ইন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বাংলাদেশী এই মেয়েটি অদ্ভুত। পড়াশোনায় খুব তুখোড়। এবং বেশ সাহসী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে-দেশে হয় নি, সে-দেশের মেয়েরা সাহসী হয় না বলে একটি কথা প্রচলিত আছে–তা সম্ভবত ঠিক নয়।

রেবেকা, চল ওঠা যাক।

তুমি যাও, আমি একটু বসব।

একা-একা বসে থাকবে?

একা কোথায়, এত লোকজন?

মি ইন চলে যেতেই রেবেকা বোনের চিঠি খুলল। বাড়ির চিঠিগুলি সে সাধারণত রাতে শোবার সময় পড়ে। পড়তে পড়তে তার চোখ ভিজে যায়। কত ছোটখাট সুখস্মৃতি মনে পড়ে সমস্ত হৃদয়কে অভিভূত করে দেয়।

আপা, তোমার দেশে ফেরার দিন তো ঘনিয়ে এল। সিরিয়াস একটা রিসেপশন আমরা তোমাকে দেব। এয়ারপোর্টে হাজির হব ফুলের মালা নিয়ে। এখনি তার প্রস্তুতি চলছে। মা সব আত্মীয়স্বজনকে চিঠি দিয়েছেন তোমার আসবার তারিখ জানিয়ে।

এদিকে ছোট দুলাভাইও মনে হয় তোমার বিরহে খানিকটা কাতর। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, তোমাদের একটা বিরাট ছবি বাঁধান। এরকম কায়দা করে তুমি ছবি কখন তুললে, তা তো জানি না। স্টুডিওতে তোলা ছবি নিশ্চয়ই। ছবিতে তোমাকে খুব ফর্সা লাগছে। আর দুলাভাইকে বেশ বোকা-বোকা লাগছে।

ভালো কথা, দুলাভাই হঠাৎ কী মনে করে গোফ রাখতে শুরু করেছিলেন। আমি এবং টুটুল স্ট্রং প্রোটেস্ট করায় সেই গোঁফ হেঁটে ফেলা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, গোঁফ থাকা অবস্থাতেই ভালো দেখাচ্ছিল। তোমার কাছে দুলাভাইয়ের একটা গোফলা ছবি পাঠালাম। তুমি তোমার মতামত জানিয়ে চিঠি দেবে। তুমি যদি ইয়েস বল তাহলে আবার গোীফ রাখান হবে।

এখন দিচ্ছি সবচে ইন্টারেস্টিং খবরটি। হোট দুলাভাই ওদের বাড়ির দোতলায় একটা ঘর তুলছেন–তুমি এসে ঐ ঘরে উঠবে। দুলাভাইয়ের এক আর্কিটেক্ট ফ্রেণ্ড ডিজাইন দিয়েছেন। শোবার ঘরের সঙ্গে ছোট্ট একটা ড্রেসিংরুম। বিরাট এ্যাটাচড় বাথ।

এই হলঘরের মতো বড়ো বাথরুমে বাথটাবের ব্যবস্থাও থাকবে। বিদেশী বাথটাবগুলির সাংঘাতিক দাম। দেশীগুলি আবার দেখতে ভালো না। গুলশান মার্কেটে মাঝে মাঝে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বিদেশী বাথটাব পাওয়া যায়। সাহেবরা ঘর ভাড়া নিয়ে নিজেরা বাথটাব ফিট করে নেয়। আবার যাবার সময় খুলে বেচে দিয়ে। যায়। দুলাভাই কিনতে চেষ্টা করছেন।

পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়। আমি তাহলে গরমের সময় তোমাদের ওখানে চলে যেতে পারি। সিনেমার নায়িকাদের মতো সাবানের ফেনার মধ্যে ডুবে থাকব, শুধু মাথাটা ভাসবে। তোমাকে এই অবস্থায় আমার একটা ছবি তুলে দিতে হবে।

আপা, আমার চিঠির সঙ্গে যে লিস্টিটা দেখছ, এটা টুটুলের। এর প্রতিটি জিনিস তোমাকে আনতে হবে। না আনলে টুটুল নাকি একটা সিরিয়াস কাণ্ড করবে। আমি কোনো লিস্ট দিচ্ছি না, তোমার শুভ বুদ্ধির উপর আস্থা রাখছি। এবং আমি জানি, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসা।

আলো মরে আসছে। রেবেকা উঠে পড়ল। তার পাশা ভাইয়ের ওখানে যেতে ইচ্ছা করছে। দেশ থেকে চিঠি পেলেই কারো সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে ইচ্ছা করে। কেন করে কে জানে? রেবেকা টেলিফোন বুথের দিকে এগোল।

হ্যালো, পাশা ভাই?

হ্যাঁ।

এমন এক দিনও গেল না, যেদিন টেলিফোন করে আপনাকে পাওয়া যায় নি। আপনি কি এক সেকেণ্ডের জন্যেও ঘর ছেড়ে কোথাও যান না?

যাই। তবে বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকি। এক সময় পুলিশ রাস্তাঘাট থেকে ইল্লিগ্যাল এলিয়েন ধরতে শুরু করল। রেগান এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শুরুর দিকের কথা বলছি। সেই

সূচিপত্র

সময় পুলিশের ভয়ে ঘর থেকে বিশেষ বের হতাম না। কাজেই ঘরে থাকতে-থাকতে ঘরে থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

এখন অভ্যাসটা বদলাতে হবে। আমাকে নিয়ে এক জায়গায় যেতে হবে।

কোথায়?

ক্রিসমাসের একটা গিফট কিনব। কী কেনা যায় বলুন তো?

কত টাকার মধ্যে কিনবে? তোমার বাজেট কত?

আগেই বাজেটের কথা বললে আমার রাগ লাগে। কী কেনা যায় সেটা আগে ভেবেটেবে বলুন। কী দিলে সবচে খুশি হবে?

খুব ভালো এক বোতল শ্যাম্পেন দিতে পার। ওরা এটা পছন্দ করবেই।

কী যে পাগলের মতো আপনার কথা! আমি তাকে মদের বোতল দেব? কী সর্বনাশ!

তুমি তো আর খাচ্ছ না। ও খাবে। এবং বেশ পছন্দ করেই খাবে।

হ্যালো, পাশা ভাই।

বল।

টুটুল একটা লিস্টি পাঠিয়েছে। অদ্ভুত সব জিনিসের নাম সেই লিস্তিতে। এগুলি কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?

নাম বল, তখন বুঝতে পারব।

একটা প্লাস্টিকের মাকড়সা, যেটা চাবি দিয়ে ছেড়ে দিলে দেয়াল বেয়ে ওঠে। একটা রবারের পুতুল তো মার্বেলের গুলির মত ছোট, কিন্তু পানিতে ছেড়ে দিলে বড়ো হতে থাকে। আরেকটা যন্ত্র, যেটা মুখে দিয়ে কথা বললে মনে হয় অনেক দূর থেকে কেউ কথা বলছে। পাশা ভাই, আপনি হাসছেন কেন?

এমনি হাসছি।

এইসব পাওয়া যায় না, তাই না?

যায় নিশ্চয়ই। কোথাও দেখেই সে লিখেছে। দেখব খুঁজে।

হ্যালো, পাশা ভাই।

বল।

আপনার ঐ খেলাটি কি ওরা কিনেছে?

পাশা কোনো জবাব দিল না। রেবেকা বিরক্ত স্বরে বলল, কথা বলছেন না। কেন? না কিনলে বলুন সেটা।

না। কেনে নি।

এখন কী করবেন?

জানি না কী করব। দেখি।

আপনার কাছে এখন মোট কত ডলার আছে?

অল্প।

অল্পটা কত বলেন। নাকি আমাকে বলা যাবে না?

সাত শ ডলারের মতো আছে। এইসব শুনে তুমি কী করবে?

রেবেকা জবাব দিল না।

পাশা বলল, কাল বিকেলে তোমাকে বাজারে নিয়ে যাব, নাকি আজই যেতে চাও?

কাল গেলেই হবে।

রেবেকা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

১১. টেলিগ্রাম আসবে

সে আশা করেছিল, টেলিগ্রাম আসবে। বড় ভাই টেলিগ্রামটিতে ড্রাফট এখনো না পাওয়ার ব্যাপারটি জানাবেন। টেলিগ্রামের ভাষা হবে–নো ড্রফট। সিরিয়াস পোবলেম। এই জাতীয় টেলিগ্রাম তিনি আগেও করেছেন। তাঁর বড় মেয়ের এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হল। তিনি টেলিগ্রাম পাঠালেন–রুমা অপারেশন। সিরিয়াস প্রবলেম। সেও মানি।

অপারেশনটি হাসপাতালে বিনা পয়সায় করা যেত। কিন্তু তিনি মেয়েকে ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভালোই করেছেন। ক্লিনিকগুলিতে আজকাল নাকি ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। পাশার কল্যাণে যদি ভালে চিকিৎসার একটা সুযোগ তৈরী হয়, যোক না। অন্তত একটি পরিবার যদি ভাবে–বড় রকমের ঝামেলাতেও তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাদের পেছনে আমেরিকান ডলার আছে। সেটাও তো মন্দ নয়। আত্মশ্লাঘার একটা ব্যাপার তো বটেই। প্রতীক্ষিত টেলিগ্রাম এবং চিঠি পাশা পেল। ক্রিসমাসের আগের দিন। টেলিগ্রামটি আর্জেন্ট। সেখানে লেখা–ড্রাফট মিসিং। টেক এ্যাকশান। কী ধরনের এ্যাকশান নেবার কথা বড়ো ভাই ভাবছেন, কে জানে।

চিঠিটা মজার। এটা পোস্ট করা হয়েছে আমেরিকা থেকে। বড় ভাই কাউকে বের করেছেন, যে আমেরিকা আসছে। এইসব কাজ তিনি খুব ভালো পারেন। তার হাত ধরে বলেছেন, ভাই রিকোয়েস্ট, এই চিঠিটা আপনি আমেরিকায় গিয়েই পোস্ট করে দেবেন। খুব জরুরী। এই কাজটা ভাই আপনাকে করতেই হবে, খুব জরুরী।

চিঠিটা দীর্ঘ। তাতে হারান ড্রাফটের পাত্তা লাগানর জন্যে তিনি এ পর্যন্ত যা যা করেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি এই প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় একটা চিঠি লিখেছেন। পাঠকের মতামত কলামে সেই চিঠি ছাপাও হয়েছে। তিনি চিঠির একটি কাটিং পাঠিয়েছেন। চিঠিটা এরকম:

বিদেশী ড্রাফট কোথায় যায়?

বিদেশ থেকে যেসব ড্রাফট বা চেক দেশে অবস্থিত আত্মীয়স্বজনকে পাঠান হয়, তার সব কি ঠিক জায়গামত পৌঁছয়? আমার তা মনে হয় না। বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের কারসাজিতে প্রায়ই একটি বিশেষ মহলের হাতে কিছু কিছু ড্রাফট বা চেক চালান হয়ে যায়। যার ফল হিসেবে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়......

দীর্ঘ চিঠি। বড়ো ভাই লিখেছেন, এই জাতীয় একটা চিঠি তিনি ইংরেজি খবরের কাগজেও লিখেছেন, তবে সেই চিঠি ছাপা হয় নি।

এ মাসের ডাফটও পাঠান হয় নি। সামনের মাসে পাঠান হবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

পাশা যে জিনিসটা করতে যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে–ডুব দেওয়া।

এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। অতীতে অনেকেই করেছে। ভবিষ্যতেও অনেকে করবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি ছেলে ছিল প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়–সে ক্রমাগত সাত বছর দেশে টাকা পাঠাল। প্রতি মাসে এক শ ত্রিশ ডলার। তার বাইরেও মাঝেমধ্যে কিছু

বড়ো অঙ্ক। ছোট ভাই পোলট্রি ফার্ম দেবে-পাঁচ শ ডলার। বোনের বিয়ে হবে–পাঁচ শ ডলার। বনগাঁয় জমি রাখা হবে–এক হাজার ডলার।

তারপর হঠাৎ এক সকালবেলা সে ঠিক করল ডুব মারবে। এবং যথারীতি তা করল। ডুব দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে ঠিকানা বদলে ফেলা। দেশের কোনো চিঠির জবাব না দেওয়া। প্রথম কয়েক বছর নিজ দেশের কারো সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা, কারণ যোগাযোগ রাখলেই মন দুর্বল হয়ে যায়। দেশে টাকা পাঠাতে ইচ্ছা করে।

টেলিফোন বাজছে। পাশা উঠে গিয়ে কোন ধরল।

হ্যালো, পাশা চৌধুরী।

বলছি।

আমি বেল টেলিফোন থেকে বলছি, আমার নাম–

পাশা তাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, আমি তোমাদের টেলিফোন বিল মিটিয়ে দিয়েছি, চেক পাঠান হয়েছে গত পরশু।

হ্যাঁ, তা আমরা জানি। তোমাকে টেলিফোন করা হয়েছে অন্য কারণে।

বল কারণটা।

তুমি জানুয়ারির এক তারিখ থেকে টেলিফোন লাইন ডিসকানেক্ট করতে বলেছ।

হ্যাঁ, বলেছি।

কেউ যদি তোমাকে পুরনো নাম্বারে টেলিফোন করে, তাহলে তাকে কি তুমি নতুন কোন নাম্বার দিতে চাও কিংবা যেখানে যাচ্ছ–তার ঠিকানা দিতে চাও? দিতে চাইলে সেটা আমার কম্পুটারে রেকর্ড করে রাখব। এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত যদি কেউ তোমাকে টেলিফোন করে, তাহলে ম্যাসেজটা পাবে।

আমি কোথায় যাব, তা নিজেও জানি না।

তার মানে কিছু দিতে চাও না?

পাশা কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বলল, এই ম্যাসেজটি দেওয়া যেতে পারে –আপনি এই নাম্বারে যাকে খুঁজছেন তিনি নেই। তাঁর কোন ঠিকানাও নেই। কি, দেওয়া যাবে?

নিশ্চয়ই যাবে। মেরি ক্রিসমাস, মিঃ পাশা।

মেরি ক্রিসমাস।

এবার কিন্তু হোয়াইট ক্রিসমাস হচ্ছে, মিঃ পাশা।

তা হচ্ছে।

ওপাশের অল্পবয়স্ক মেয়েটির হয়তো আরো কিছু বলার ছিল। পাশা টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

১২. বাড়ি বিশাল

প্রফেসর ওয়ারডিংটনের বাড়ি বিশাল।

ছবিতে দেখা বাড়ির মতই কাঠের তৈরী, রেবেকা মুগ্ধ হয়ে গেল। ওয়ারডিংটন খুব উৎসাহের সঙ্গে রেবেকাকে সমস্ত বাড়ি দেখাতে লাগলেন–

বুঝলে রেবেকা, আমি এবং আমার স্ত্রী–এই দুজনে মিলেই এই বাড়ি তৈরি করতে শুরু করি। সামারে লেকের পাশে তাঁবু খাটিয়ে দুজন থাকতাম, সারা দিন কাজ করতাম। সম্বলের মধ্যে ছিল একটা ইলেকট্রিক করাত আর আমার ল্যাণ্ড রোভার গাড়ি। বন থেকে কাঠ কেটে আনতাম, কপিকল দিয়ে সেই কাঠ উপরে তুলে আস্তে আস্তে নামান হত। এক বার কী হল শোন, লুসি হঠাৎ একটা কাঠ ফেলে দিল আমার হাতে।

লুসি বিরক্ত স্বরে বলল, তুমি এমনভাবে বলছ, যেন ইচ্ছা করে ফেলে। দিয়েছি।

ওয়ারডিংটন হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

আমরা এক সামারেই মোটামুটি থাকবার মত ঘর বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু মজা কি জান, রেবেকা, ঘর তৈরী হলেও আমরা গোটা সামারটা বনেই কাটালাম। তাই না সুসি?

লুসি জবাব দিল না।

ওয়ারডিংটন বললেন, কেন বনে কাটালাম, সেই গল্প কি এই মেয়েটিকে বলে দেব লুসি?

কেন বেটারিকে গল্প বলে-বলে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ। ওকে নিজের মতো থাকতে দাও।

না, গল্পটা বলেই ফেলি। বুঝলে রেবেকা, আমরা বনে থাকতাম–কারণ সেই সময় আমাদের অনেক পাগলামি ছিল। আদম এবং ঈভের মতো থাকতে হচ্ছিল। হা-হা-হা। আশপাশে তখন এত বাড়ি-ঘর ছিল না, কাজেই আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। তাই না লুসি? এ কি! এই বয়েসেও তুমি ফ্লাশ করছ, ব্যাপারটা কী?

ওয়ারডিংটন এবং তাঁর স্ত্রী ক্রিসমাস করছেন একা-একা। তাঁদের দুই ছেলে এবং তিন মেয়ের সবাই বাইরে। এক মেয়ে ফিলিপাইনে। ছেলেদের এক জন কোন এক যুদ্ধজাহাজে ভাসছে প্রশান্ত মহাসাগরে। রেবেকা থাকতে থাকতেই ছেলেমেয়েদের টেলিফোন আসতে শুরু করল।

লুসি বলল, আমাদের ক্রিসমাস ট্রী তোমার পছন্দ হয়েছে, রেবেকা?

খুব পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর করে সাজান।

ছেলেমেয়েরা যখন সঙ্গে ছিল তখন ওরা সাজাত, এখন আমাদেরকেই সাজাতে হয়। তখন বেশ খারাপ লাগে। সাজাতে-সাজাতে আমরা দুজনেই কিন্তু কাঁদি। কারণ এখানে অনেক ডেকোরেশন পিস আছে, যার সঙ্গে খুব কষ্টের কিছু গল্প আছে। যেমন ঐ যে রুপোর নেকলেসটা ঝুলছে, ওটা ছিল এলিজাবেথের। ও এগার বছর বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায়।

লুসি চোখ মুছল।

ওয়ারডিংটন বললেন, আজকের দিনে ঐসব কথা মনে করে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে বরং গিফটগুলি খোল। প্রথমে রেবেকার গিফটগুলি তাকে দাও।

রেবেকা তার গিফট পেয়ে আকাশ থেকে পড়ল। অত্যন্ত দামী একটা ক্যামেরা দিয়েছে লুসি। ওয়ারডিংটন দিয়েছেন একটা মাখনের মতো নরম কম্বল। নিশ্চয়ই খুব দামী জিনিস। এ ছাড়াও গিফট ছিল। তাঁদের যে-মেয়ে কেনসাসে থাকে সে বাবার কাছে শুনেছে ক্রিসমাসের দিন এখানে একজন বিদেশী আসবে, কাজেই সে পাঠিয়েছে এ্যালবাম। সিয়াটলে তাদের হোট ছেলে থাকে, সে পাঠিয়েছে চামড়ার একটা ব্যাগ।

রেবেকার পর মার্টির গিটগুলো খোলা হল। মাটি হচ্ছে তাদের কুকুর। প্রায় অথর্ব। বয়সের কারণে এখন সে আর চোখে দেখে না। কানেও বোধহয় শুনতে পায় না। বিচিত্র সব উপহার পেয়েছে মার্টি। সেই উপহারের সবগুলি অন্ধ ও বধির মার্টির চারপাশে সাজিয়ে দেওয়া হল। ছেলেমেয়েদের সবাই উপহারের সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়েছে–আমার হয়ে মাটিকে চুমু খাবে।

পাঁচ ছেলেমেয়ের জন্যে গুনে গুনে পাঁচ বার চুমু খেল লুসি, তারপর চোখ মুছতে লাগল।

ওয়ারডিংটন বললেন, মাটি আমার সন্তানের চেয়েও বেশি। বেচারার যা অবস্থা এখন, ওকে মেরে ফেলে জীবনের সব কষ্ট দূর করে দেওয়াই উচিত। এইটিই হচ্ছে। ওর জীবনের শেষ ক্রিসমাস।

ওকে মেরে ফেলবেন।

হ্যাঁ। দু-এক দিনের ভেতরই অপ্রিয় কাজটা করব। লুসি, তুমি মন শক্ত করেছ তো?

লুসি কিছু বলল না। মাটি লেজ নাড়াতে লাগল। পশুরা অনেক কিছু টের পায়।

ওয়ারডিংটন বললেন, এস রেবেকা, পোর্চে বসি।

রেবেকা পোর্টে গিয়ে বসল। পোর্চ অসম্ভব ঠাণ্ডা। একটা বড় পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে মাঝখানে রাখা হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আগুনের পাশে বসে থাকতে ভালোই লাগছে। ওয়ারডিংটন পাইপ ধরাতে-ধরাতে বললেন, তোমাকে এমন মনমরা লাগছে কেন?

রেবেকা কিছু বলল না।

দেশ থেকে কি কোনো খারাপ খবর পেয়েছ?

না।

তাহলে এত মন খারাপ করে আছ কেন?

রেবেকা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার খুব শখ পি-এইচ. ডি করার।

সেই শখ পূরণে তো কোনো বাধা দেখছি না।

রেবেকা থেমে থেমে বলল, আমার ক দিন থেকেই মনে হচ্ছে আমাকে থাকতে দিতে কেউ রাজি হবে না।

কে রাজি হবে না?

আমার বাবা-মা। আমার স্বামী।

তোমার নিজের কেরিয়ার তুমি দেখবে না? কে কী বলল না-বলল, তাতে কী যায় আসে?

সব সময় আমরা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারি না।

কেন পারি না, সেটা আমাকে বল।

রেবেকা চুপ করে রইল।

যুক্তিগুলি কী, আমাকে বল। যুক্তিগুলি শুনি।

ওদের যুক্তি আমার ভালো জানা নেই।

রেবেকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার চোখ ভিজে উঠেছে। এই ভেজা চোখ সে কাউকে দেখাতে চায় না।

১৩. চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত

মা রেবা,

তোমার চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছি। কী করে তুমি এমন একটি ডিসিশান একা-একা নিতে পার? এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে কারো সঙ্গে তুমি যোগাযোগরও প্রয়োজন মনে করলে না? হুট করে ঠিক করলে পিএইচডি করবে। সুযোগ পেয়েছ-ভালো কথা। সুযোগ পেলেই সব সুযোগ নেওয়া যায় না। সুযোগ মানুষের জীবনে সব সময়ই আসে। একটি দিক দেখলে হয় না, সব দিক দেখতে হয়। চার-পাঁচ বছর তুমি একা-একা আমেরিকায় থাকবে এটা একটা কথা হল? আর জামাই তার চাকরিবারি ছেড়ে তোমার সঙ্গে থাকবে, এটাইবা ভাবলে কী করে? তুমি তোমার ট্রেনিং শেষ হওয়ামাত্র দেশে রওনা হবে। আমার ধারণা আমেরিকায় গিয়ে ওদের চাকচিক্য দেখে তোমার মাথা ঘুরে গেছে। এটা ঠিক না। নিজের অবস্থানটা আগে জানা থাকা দরকার।

ছোট জামাই এখন ঢাকা নেই। সেরাজশাহীতে তার বোনের বাড়িতে গিয়েছে এক সপ্তাহের জন্যে। কাজেই তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনো আলোচনা করতে পারছি না। তবে আমার ধারণা সে যথেষ্টই বিরক্ত হবে।

মা, তুমি এই নিয়ে আর কোনো লেখালেখি করবে না। চলে আসবে। তোমার মাও এ ব্যাপারে খুব অসুখী। দোয়া নিও।

রইসউদ্দিন

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হোট আপা,

তোমার চিঠি পড়ে সবাই খুব আপসেট। সবচে বেশি আপসেট মা। তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন। তার ধারণা আমেরিকায় তোমার থেকে যাবার যে-ইচ্ছা, তাঁর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।

তুমি তোমার বেশ কিছু চিঠিতে পাশা চৌধুরী নামের এক জন ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করেছ। মার চিন্তা তাকে নিয়ে। আমি জানি এসব খুবই আজেবাজে চিন্তা, তবু আপা– আমার নিজেরও খানিকটা ভয়-ভয় লাগছে। প্লীজ তুমি চলে আস।

ভালো কথা, তুমি ছোট দুলাভাইকেও ঐ ভদ্রলোকের কথা লিখেছ। ঐদিন ঘোট দুলাভাই তা নিয়ে খুব ঠাট্টা-তামাশা করলেন। তুমি সত্যি থেকে গেলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা-তামাশার পর্যায়ে থাকবে না।

দুলাভাই এখন পর্যন্ত তোমার পিএইচডি এনডোলমেন্টের কোনো খবর জানেন না। তিনি ঢাকায় নেই। যখন জানবেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা কী হবে, তাই ভেবে খুব খারাপ লাগছে।

টুটুল বরিশাল গিয়েছে বড়ো দুলাভাইকে আনবার জন্যে। কী যে ঝামেলা তুমি তৈরি করেছ আপা! ভালোবাসা নাও। কাল আবার একটা চিঠি দেব।

ফরিদা ইয়াসমিন

১৪.আকাশে নক্ষত্রের মেলা

নো ড্রাফট দিস মানথ।

লাস্ট মানথ ড্রাফট, স্টিল মিসিং।

বিগ প্রবলেম। ভেরি ওরিড।

রেবেকা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দু দিন আগে। বরফে পা পিছলে বাঁ হাতের রেডিও আলনা এবংকলার বোন দুটোই ভেঙেছে। সামান্য পা হড়কান থেকে এমন জটিলতা তৈরী হতে পারে তা তার কল্পনাতেও আসে নি। প্রথম দিনটা তার খুব খারাপ কাটল। একা-একা খানিককক্ষণ কাঁদল। দ্বিতীয় দিনে জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। অপরিচিত হাসপাতাল, অপরিচিত লোকজনদের মধ্যে এমন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল নিজেকে।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলা পাশা তাকে দেখতে এল। রেবেকা থমথমে গলায় বলল, আপনার জন্যেই আমার এই অবস্থা।

কেন, আমার জন্যে কেন?

আপনি আমাকে বরফে হাটার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছেন, সেই কায়দায় হাঁটতে গিয়ে।

পাশা হেসে ফেলল।

রেবেকা গম্ভীর হয়ে বলল, আমার জন্যে কী এনেছেন বলুন? নাকি খালিহাতে রোগী দেখতে এসেছেন?

খালিহাতেই এসেছি।

মার্থা আমাকে একটা কার্ড দিয়ে গেছে। দেখুন কার্ডে কী লেখা।

পাশা হাসিমুখে কার্ডটা পড়ল। কার্ডে লেখা, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি মানুষ। তুমি ঘোড়া হয়ে জন্মালে তোমাকে মেরে ফেলা হত। পা-ভাঙা ঘোড়াকে সব সময় মেরে ফেলা হয়।

পাশা চেয়ার টেনে পাশে বসতে-বসতে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন?

ভালো–তবে জ্বর আছে।

বেশি জ্বর?

বেশি জ্বর কি কম জ্বর সেটা আপনি আমার কপালে হাত দিয়ে দেখতে পারেন না? নাকি সেটা করলে আপনার পাপ হবে?

পাশা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

রেবেকা মৃদু স্বরে বলল, আমি সব সময় লক্ষ করেছি, আপনি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

এরকম মনে করার কোন কারণ নেই, রেবেকা।

নিশ্চয়ই আছে। আমি প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণও আছে তোমার কাছে?

নিশ্চয়ই আছে। সতেরই ডিসেম্বরের কথা মনে করে দেখুন। আপনার ওখানে গিয়েছি, কথা বলতে-বলতে রাত হয়ে গেল। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমাকে ডরমিটরিতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। আপনার গাড়ি নষ্ট। আপনি টলিফোন করে একটা ট্যাক্সি আনালেন। অথচ ইচ্ছা করলে আপনি বলতে পারতেন–রেবেকা থেকে যাও। কেন বলেন নি?

পাশা চুপ করে রইল।

আপনার কি ধারণা, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি? না, আপনি বলুন–আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই।

পাশা অবাক হয়ে লক্ষ করল রেবেকার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। কী অসম্ভব জটিলতা এই পৃথিবীতে। পাশা দীর্ঘ সময় নীরবে বসে রইল। রেবেকা বলল, কই, আপনি তো আমার জ্বর দেখলেন না।

পাশা তার কপালে হাত রাখল। বেশ জ্বর গায়ে।

রেবেকা বলল, মানুষ তার খুব প্রিয়জনদের মনের কথা বুঝতে পারে, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?

করি না। এক জনের মনের কথা অন্য জনের জানার কোনোই বৈজ্ঞানিক কারণ নেই।

কিন্তু আমি পারি। এখন আমি খুব ভালো করে জানি, আপনি এই শেষ বারের মতো আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আপনি ফার্গো ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? ঠিক না?

পাশা কিছু বলল না।

বলুন, আমি ঠিক বলছি না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছ।

কোথায় যাচ্ছেন?

জানি না কোথায়। আমার কোন শিকড় নেই, রেবেকা।

কী করবেন, কোথায় যাবেন–কিছুই জানেন না?

পাশা জবাব দিল না।

রেবেকা বলল, দেশের কেউ চাচ্ছে না আমি এখানে আরো কিছু দিন থাকি। কিন্তু আমি থাকব। আমি অনেক বড় হতে চাই, পাশা ভাই।

সবাই চায়।

কিন্তু সবাই পারে না, এই তো বলতে চান? আমি পারব।

হ্যাঁ, তা পারবে। তোমার ক্ষমতা আছে।

আচ্ছা, আমি যদি একটা দু রুমের বাড়ি ভাড়া করে আপনাকে কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকতে বলি, আপনি থাকবেন?

এটা কেন বলছ? কেন থাকব?

যাতে আবার আপনি ঐসব খেলাটেলা লিখে কিছু টাকাপয়সা করতে পারেন, তারপর দেশে ফিরে আমার মতো ভালো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন। তখন আপনার শিকড় হবে।

পাশা হাসল। রেবেকা থমথমে গলায় বলল, আপনি হাসছেন কেন?

পাশা বলল, আজ তোমার বেশ জ্বর। জ্বর কমুক, তারপর কথা বলব। আমি কাল আসব।

আমি জানি, আপনি আর আসবেন না। এবং এও জানি, কেউ আমাকে এখানে থাকতে দেবে না। যথাসময়ে আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। আপনি কি চলে। যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কাল সত্যি-সত্যি আসবেন?

হ্যাঁ, আসব।

আমার গা ছুঁয়ে বলুন।

পাশা তাকিয়ে রইল। জ্বরতপ্ত একটি কোমল মুখ। বালিশের চারদিকে ছড়িয়ে আছে ঘন কালো চুল। কেন জানি বারবার সেই চুলে হাত রাখতে ইচ্ছা করছে।

রেবেকা বলল, কি, কথা বলছেন না কেন?

আসব, আমি কাল আসব।

আমার গা ছুঁয়ে বলুন। আমার হাত ধরে বারবার বলুন।

পাশা তার হাত ধরে কথাগুলি আবার বলল। রেবেকা চোখ বন্ধ করে ফেলল। দীর্ঘ সময় সে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। চোখ জ্বালা করছে। সে মৃদু স্বরে বলল, কেন আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছেন?

মিথ্যা কথা বলছি?

হ্যাঁ, বলছেন। কেন বলছেন? আমি তো কখনো আপনার সঙ্গে মিথ্যা বলি না। পাশা কিছু বলল না। রেবেকা ফিসফিস করে বলল, আমি খুব ভালো করে জানি, আপনি আর কোন দিন আসবেন না।

আজ উঠি রেবেকা?

না। আপনি বসে থাকুন। বসে-বসে গল্প করুন।

কী গল্প?

আপনার ছেলেবেলার গল্প।

আমার ছেলেবেলার কোন গল্প নেই, রেবেকা। সবার কি আর গল্প থাকে?

তাহলে আপনার যৌবনের গল্প বলুন।

তুমি ঘুমুতে চেষ্টা কর তো, রেবেকা।

না, আমি ঘুমুতে চেষ্টা করব না। আমি জেগে থাকব। আর অনবরত কথা বলব। আর আপনার হাত ধরে থাকব। হাত ছাড়ব না। কিছুতেই না।

তৃতীয় দিনে রেবেকার জ্বর আরো বাড়ল। কেন বাড়ল, ডাক্তাররা ধরতে পারলেন না–ভাঙা হাড়ের কারণে কোনো কমপ্লিকেশন, নাকি ভাইরাসঘটিত কোনট সংক্রমণ?

রেবেকা সমস্ত দিন আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল। সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতে এল আরিয়ে রত্না চন্দ্রাণী। সে রেবেকার চিঠি নিয়ে এসেছে।

চিঠি লিখেছে তার বর। এইটি এমনই এক চিঠি যা লক্ষ বার পড়া যায়। এবং কখনো পুরনো হয় না।

প্রিয়তমাসু, তুমি পি-এইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছ শুনে বেশ অহংকারই হল। সাধারণ একটি বি.এ. পাস ছেলের পিএইচডি স্ত্রী। কী সর্বনাশ।

রেবেকা, এটা একটা চমৎকার সুযোগ। আমার মত দরিদ্র মানুষ তো তোমাকে আমেরিকা পাঠিয়ে পড়াশোনা করাতে পারবে না। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতায় তুমি তা অর্জন করেছ। কী করে তুমি ধারণা করলে তোমার এই যোগ্যতার আমি দাম দেব না?

এত দীর্ঘদিন একা একা থাকতে আমার খুব কষ্ট হবে। তোমারও হবে। দুঃখকষ্ট তো পৃথিবীতে আছেই–কি বল?

আরিয়ে রত্ন বলল, কী আছে চিঠিতে? এত কাঁদছ কেন? এই রেবেকা, কী ব্যাপার?

অনেক রাতে পাশা তার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামল। কোথায় যাবে? এখনো কিছু ঠিক করা হয় নি। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। কিছু পুরনো বন্ধুবান্ধব আছে মন্টানাতে। তাদের কাছে যাওয়া যেতে পারে, আবার নাও যাওয়া যেতে পারে। এক জন শিকড়হীন মানুষের কাছে সবই সমান।

রাস্তা নির্জন। দু পাশে প্রেইরির সমভূমি, বরফে-বরফে সাদা হয়ে আছে। বিশাল একটি বাটির মত আকাশটা চারদিক ঢেকে রেখেছে। আকাশে নক্ষত্রের মেলা। কী অদ্ভুত তাদের আলো! নক্ষত্রের আলোয় কেমন অন্য রকম লাগে। বড়ো ইচ্ছা করে কারো কাছে যেতে।